ইসলাম, তাসাওউফ, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও পীর-মুরিদ সম্পর্ক

"হে মুমিন গণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং উলিল আমরের, (যারা তোমাদের মধ্যে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্র অনুগত এবং রাসূলুল্লাহ্র অনুগামী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রাজ্ঞ, যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (দঃ) নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিশুদ্ধ এবং সুন্দর করতে প্রতিশ্রুত) কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" – (সূরা নিসা : ৫৯)

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

ইসলাম, তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং পীর-মুরিদ সম্পর্ক

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

আলোকধারা বুকস্
এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন
চট্টগ্রাম।

ইসলাম, তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং পীর-মুরিদ সম্পর্ক
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট প্রকাশন
আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশঃ
জানুয়ারি ২০১৮
আ. বু-১৯

প্রচ্ছদঃ ইমেজ সেটিং
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুদ্রণঃ দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্যঃ ৫০ টাকা মাত্র।

ISBN 978-984-92208-5-5

সূচী:

১. ইসলাম ও তাসাওউফ -------------------------------- ৬

২. প্রকৃত পীরের পরিচয় ------------------------------- ৩১

৩. পীরের আবশ্যকীয়তা এবং পীর মুরিদের সম্পর্ক -------- ৪০

৪. আল্লাহ্‌র অলিগণ ইন্তিকালের পরেও সশরীরে
বর্তমান এবং সমভাবে সক্রিয় ------------------------ ৬১

ভূমিকা

'ইসলাম, তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং পীর-মুরিদ সম্পর্ক' বৃহৎ কলেবরের নিবন্ধটি ২০০৮ সালে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া' গ্রন্থের মধ্যে তাসাওউফ বিষয়ক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে তাসাওউফ বিষয়ে একটি বিশেষ মহলের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ পরিসরের এ নিবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্য 'আলোকধারা বুক্স' কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পুস্তিকায় তাসাওউফ তথা সুফিবাদ, আল্লাহ্ এবং রাসূলের (দ.) সত্য পথ প্রদর্শক হিসেবে পীরের প্রয়োজনীয়তা, পীর-মুরিদ সম্পর্ক বিষয়ে বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠকের ধৈর্য এবং আর্থিক সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রেখে এ নিবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হল। আশা করি পুস্তিকাটি পাঠকের মনোবাসনা পূরণে সহায়ক হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
সভাপতি
গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
এবং
প্রাক্তন প্রফেসর
অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম
ও তাসাওউফ

ভূমিকা: আজ সারা বিশ্বে চলছে সন্ত্রাস, রাহাজানি, ডাকাতি, নিধনযজ্ঞ, প্রতারণা ও বঞ্চনা। মানুষে মানুষে আজ আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এক দিকে সাত তলা ভবনের উপর চোখ ঝল্সানো নিয়ন আলো, আর অন্যদিকে ফুটপাতের জীর্ণশীর্ণ বস্তিগুলো। শাসনের নামে শোষণের যাঁতাকলে এক দিকে পিষ্ট হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যা খেটে খাওয়া সর্বহারার দল, অন্যদিকে কেউ কেউ সর্বহারাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অগাধ সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক হচ্ছে। বিশ্বের সকল মানুষ আজ তাই স্থিতিশীলতা চায়, নিরাপত্তা চায়, চায় সম্পদের কাম্য বন্টন। আজ মানুষ এমন একটি বিশ্ব চায় যেখানে থাকবে উন্নয়ন, কল্যাণ, প্রেম, মানবতা, সৌন্দর্য্য এবং আশীর্বাদ। বিশ্বের মানুষকে আজ তাই তাসাওউফ ভিত্তিক ইসলামী জীবনাদর্শ আকৃষ্ট করছে। তারা আজ অনুভব করছে যে, একমাত্র তাসাওউফ ভিত্তিক ইসলামী জীবনাদর্শ দিতে পারে তাদের মুক্তির সন্ধান।

তাসাওউফ ও ইসলামী জীবনাদর্শ: ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষকে সত্য ও ন্যায় পথে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। নিছক পার্থিব স্বার্থপরতাকে পরিহার করে পরিপূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করার জন্য ইসলাম মানব সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামের সকল আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ মানুষের মানবতা গুণকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে এবং মানুষের সকল কু-প্রবৃত্তি বিনাশ করে একটি একক স্বর্গীয় সত্তায় গ্রথিত করে। ইসলামের সাথে তাসাওউফ-এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য হল তাসাওউফ।

তাসাওউফ মানে কি?: "তাসাওউফ" শব্দটি সহজবোধ্য নয়। এটা অতি সূক্ষ্ম এবং উপলব্ধির ব্যাপার। তাসাওউফের আভিধানিক অর্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা খোদা-পরিচিতি জ্ঞান। ফতোয়া-আজিজিয়া কিতাবের বর্ণনা মতে, তৌহিদের ভাব-প্রবণতা, ছায়র মায়াল্লাহ্, নৈকট্য, মহব্বত, বন্ধুত্ব, বেলায়ত ও আউলিয়ার মরতবা সম্বন্ধে

রহস্যজ্ঞান ইলম অর্থাৎ ইতেকাদজনিত রা'জ রহস্যাবলীর মোকাশেফার সাথে সম্পর্কযুক্ত ইলমকে মারিফাত বলে। মারিফাতের সকল তাৎপর্য শরীয়তের (অর্থাৎ ইতেকাদ, আমল, স্বভাব, নিয়ত, অবস্থা এবং যাহা কোন বিশেষ কারণে ছেড়ে দেয়ার জন্য ও ছেড়ে না দেয়ার জন্য দৃঢ় নির্দেশ রয়েছে এবং ইবাদতে মালী ও বদনী সংক্রান্ত জরুরী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত) অন্তর্ভুক্ত বিধায় এ সকল বিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে মাসায়েলার কোন দলিল নাই, তা বেছে নিয়ে দলিলের সাথে যুক্ত করতঃ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক দ্বিতীয় এক ইল্‌মের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এই ইলমকে 'ইল্‌মে তাসাওউফ' বলা হয়। এটা সমস্ত ইলম সম্বলিত অতীব প্রয়োজনীয় জ্ঞান যা খোদা পরিচিতির দিশারী। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানবের সাহচর্যে তা হাসিল হয়। 'সামশুল আরেফীন' কিতাব অনুযায়ী জ্ঞান দুই প্রকার. অর্জিত জ্ঞান (ইল্‌মে হুছুলী) এবং দর্শন জ্ঞান (ইল্‌মে হুজুরী)। অর্জিত জ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধির দ্বারা বস্তুর পরিচয় লাভ যা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং দর্শন জ্ঞান কলবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্জিত জ্ঞান দ্বারা কখনও খোদা পরিচিতি লাভ করা যায় না। এ প্রসংগে রূহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বর্ণনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "হে রসূল! রূহ্‌ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন, রূহ্‌ আল্লাহ্‌র হুকুম। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮৫)

সুতরাং বুঝা যায়, অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা রূহের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যেখানে সম্ভব হয় না, তা দ্বারা বে-মেসাল নিরাকার খোদার দিদার লাভ করা সম্ভব নয়। তার জন্য দর্শন জ্ঞান বা ইল্‌মে হুজুরী প্রয়োজন।

রসূল (দ.) বলেছেন, জ্ঞান দু'প্রকার. অ-উপকারী জ্ঞান বা ভাষাগত জ্ঞান এবং উপকারী জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান (শিবয়াতুল ইসলাম কিতাব)। ভাষাগত জ্ঞান হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দলিল এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে ইল্‌মে মারিফাত। হযরত হাসান (র.) সূত্রে এহয়াউল উলুম কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, রসূল (দ.) এর মতে জ্ঞান দু'প্রকার (১) জাহেরী জ্ঞান, (২) লাভদায়ক জ্ঞান বা ইল্‌মে নাফে (বাতেনী জ্ঞান)। বাতেনী জ্ঞান কলবের মধ্যে নিহিত। আল্লাহ্‌পাক রসূল (দ.) এর সাথে মি'রাজের রাত্রে নব্বই হাজার কালাম করেছেন। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার জাহেরী শরিয়ত এবং ষাট হাজার ইল্‌মে বাতেন। আল্লাহ্‌ পাকের আমানতদার অলিগণ ব্যতিত তা কেউ বর্ণনা করতে পারেন না। যারা আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় জ্ঞাত হতে অনাগ্রহী তারা মুক্তার মত এ গোপনীয় সম্পদকে অস্বীকার করে। হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হযরত রসূলে করিম (দ.) এর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আ.) তিনটি প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

প্রথম প্রশ্নঃ ইসলাম কি?: হযরত রসূল করিম (দ.) এর উত্তরঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (দ.) তাঁর রসূল; এ সত্যের ঘোষণা, নামায কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং সমর্থ হলে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ তথা হজ্ব করা হচ্ছে ইসলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঈমান কি?: হযরত রসূল করিম (দ.) এর উত্তরঃ আল্লাহ্র প্রতি, ফেরেশ্তাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ও কিয়ামতের উপর এবং তকদীরের ভাল-মন্দ সমস্ত আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

তৃতীয় প্রশ্নঃ ইহ্সান কি?: হযরত রসূল করিম (দ.) এর উত্তরঃ ইহ্সান হল এই, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এরূপে কর যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহ্কে) দেখছ। যদি তুমি তাঁকে (আল্লাহ্কে) দেখতে অক্ষম হও, তা'হলে তুমি বিশ্বাস কর যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহ্লবীর মতে, প্রথম প্রশ্ন দ্বারা ফিকাহ্র দিকে ইশারা করা হয়েছে যাতে শরীয়তের আদেশ ও আমলসমূহের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বারা এতেকাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা' আল্লাহ্পাকের নৈকট্য ও ভাবপ্রবণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, ফিকাহ্, ইতেকাদ বা আকাঈদ ও তাসাওউফের সম্মিলিত নাম হচ্ছে শরীয়ত। এই তিন প্রকার ইল্মের অধিকারীগণকে উলিল আমর বলা হয়, মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ও রসূল করিম (দ.)-এর অনুসরণ কর এবং উলিল আমরের আনুগত্য স্বীকার কর।" (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তাসাওউফ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরঞ্চ বাহ্যিক বা অর্জিত জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য আধ্যাত্মিক বা দর্শন জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। উদাহরণ হিসেবে পবিত্র কুরআন মজিদে বর্ণিত সূরা কাহাফের ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করছিঃ

হযরত খাজা খিজির (আ.) কতগুলো বালকের সাথে ক্রীড়ারত সবচেয়ে সুদর্শন যুবকটিকে লাঠির আঘাতে হত্যা করলেন যা হযরত মুসা (আ.) এর দৃষ্টিতে অমানবিক ও পাশবিক কাজ মনে হলো। কিন্তু হযরত খাজা খিজির (আ.) ঠিক কাজই করেছিলেন। কারণ, "ঐ যুবকটি ছিল শয়তান। সে ভবিষ্যতে অন্যান্য বালকের ক্ষতি করত।" হযরত খাজা খিজির (আ.) তাঁর দর্শন জ্ঞানের সাহায্যে তা বুঝতে পেরেছিলেন। অনুরূপভাবে, যখন এপার থেকে ওপারে নতুন নৌকাটি দিয়ে পাড়ি

দেবার পর হযরত খিজির (আ.) নৌকাটিকে ফুটো করে দিলেন, তাও হযরত মুসা (আ.) এর কাছে ভাল ঠেকেনি। কিন্তু হযরত খিজির (আ.) দর্শন জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওপারের অত্যাচারী রাজার অনুচরেরা ভাল নৌকা ছিনিয়ে নেবে। তাই তিনি নৌকাটিকে ফুটো করে দিয়েছিলেন যাতে গরীব মাঝির নৌকাটি ঐ অত্যাচারী রাজার অনুচরেরা ছিনিয়ে না নেয়। অতএব বুঝা যায়, দর্শন জ্ঞান হচ্ছে অর্জিত জ্ঞানের পরিপূরক। অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা যা জানা সম্ভবপর হয়নি, দর্শন জ্ঞানের দ্বারাই তা বুঝা বা জানা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ; দর্শন জ্ঞান বা তাসাওউফ মানুষকে খোদার রহস্য উপলব্ধির ক্ষমতা প্রদান করে। সাধারণতঃ সুফিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা খোদা পরিচিতি জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে বিধায় 'তাসাওউফ'কে সুফিবাদ বা মরমীবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সুফি এবং অলি সমার্থক। সুতরাং, সুফিবাদকে অলিবাদ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলিগণ গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (ক.), হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.), হযরত হাফেজ সিরাজী (র.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.), অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রমুখ উচ্চ পর্যায়ের সুফি সাধকও ছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে অলিদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার ফসল হচ্ছে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

অলিদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা কি? অলিদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা হচ্ছে স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে। কিভাবে স্রষ্টার রেজামন্দি হাসিল করা যায়, কিভাবে স্রষ্টার দিদার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবন করাই হচ্ছে অলিদের নিয়মিত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা। স্রষ্টার রেজামন্দি হাসিলের জন্য, স্রষ্টার দিদার লাভ করার জন্য স্রষ্টাকে ভালবাসতে হবে। স্রষ্টাকে ভালবাসার উপায় কি? স্রষ্টাকে ভালবাসতে হলে স্রষ্টার হুকুম-আহ্‌কাম পালন করতে হবে, স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবাসতে হবে, মোরাকাবা-মোশাহেদা করতে হবে, জিকির বা খোদাকে স্মরণ করতে হবে এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। নৈতিক উৎকর্ষ কিভাবে অর্জন করা যায়? নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করা যায় দেহ ও মনকে সুন্দর করে, চরিত্রকে পূত ও পবিত্র করে। দেহ, মন ও চরিত্রকে কিভাবে সুন্দর ও পবিত্র করা যায়? দেহ, মন ও চরিত্রকে সুন্দর ও পবিত্র করা যায় সকল প্রকার কু-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

কু-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন কিভাবে করা যাবেঃ কু-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কুরআন মজিদ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল করিম (দ.)-এর সুন্নাহ্তে প্রদর্শিত এবং অলিদের আচরণে, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় প্রতিফলিত পথে, যা পবিত্র কুরআনে সিরাতুল মুস্তাকীম হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাং, 'তাসাওউফ' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা খোদাকে চেনা যায়, খোদাকে পাওয়া যায়, আত্মাকে আলোকিত করা যায়। এটি এমন একটি জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, স্রষ্টাতে সৃষ্টি বিলীন হয়ে যায়, সৃষ্টি স্রষ্টার একত্বে মিশে যায়। ফলে 'তাসাওউফ' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা 'ইল্‌মে তাসাওউফ'-এর দ্বারাই গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) গভীর অরণ্যে বাঘের মুখোমুখি লোকটিকে বহু দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং এক পলকে বহু দূর থেকে বাঘের মুখে লোটা নিক্ষেপ করে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) হাটহাজারীস্থ ঘড়ির দোকানদারের যৌতুক প্রদানের অক্ষমতা জানতে পেরেছিলেন এবং তাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিশেষ জ্ঞানের বলেই খাজা-খিজির (আ.) যা জানতে পেরেছিলেন, হযরত মুসাকে (আ.) পার্থিব বিধান সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ করায় এবং আল্লাহ্ স্বীয় রহস্যময় বিষয়টি অবহিত না করায় তা জ্ঞাত হননি। হযরত মুসার (আ.) মাধ্যমে অনেক মোযিজা আল্লাহ্ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অর্থবহ মোযিজাসমূহ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা। হযরত খিজিরের (আ.) সঙ্গে হযরত মুসার (আ.) ঘটনাসমূহ কার্যত আদম সন্তানদেরকে ইল্‌মে মারিফাত সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ সংঘটিত করেছেন। তবে সূরা কাহাফে বর্ণিত ঘটনাপঞ্জীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুসাকে (আ.) তাসাওউফ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে মানবজাতির বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত বিধি বিধান শুধু মাত্র বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা এবং এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সৃষ্টির যাবতীয়-রহস্য ভাণ্ডার– বেলায়তের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে। আর বেলায়ত হল তাসাওউফ সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি – (সূরা কাহাফ এর মর্মার্থ)। 'তাসাওউফ'-এমন একটি জ্ঞান যা খোদার নিকট থেকে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি লাভ করা যায়। এ 'তাসাওউফ' শক্তির বলেই হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) বলেছিলেন, "আনাল হক" অর্থাৎ আমি সত্য। এ 'তাসাওউফ' শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) বলেছিলেন, "আমার শান কত বড়।" ইল্‌মে তাসাওউফের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, প্রেমজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রসূল করিম (দ.) এর দাঁত মোবারক শহীদ হবার খবর শুনে হযরত ওয়ায়েজ করণী (রা.) তাঁর বত্রিশটি দাঁত উপড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তাসাওউফ অনুসারে আল্লাহ্ অনন্ত অসীম প্রেমময়।

আল্লাহ্ মানবের প্রেমাস্পদ। ধর্মের অন্তর্নিহিত নাম প্রেম। সুতরাং, মানব জীবনের পরম সম্পদ হচ্ছে খোদার ভালবাসা অর্জন। সকল মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত খোদার প্রেমে প্রেরণাদীপ্ত হওয়া। কেননা, মানবের সাথে খোদার সম্পর্ক হচ্ছে অন্তহীন প্রেমের। তাসাওউফ বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ এবং বৌদ্ধদের শূন্যতাবাদ সমর্থন করে না। তাসাওউফ জীবনধর্মী আধ্যাত্মিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সুফিবাদ বা তাসাওউফ অনুযায়ী জগৎ বাস্তব এবং জগতে পরম সত্তার স্থান আছে। আল্লাহ্র রহস্য বোঝার সাধ্য মানুষের নেই। আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য জাগতিক জীবন ও কর্ম প্রবাহকে আত্মশুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও অহংবোধ বিসর্জনের মাধ্যমে আমিত্বকে বিলীন করার শক্তি অর্জনই হচ্ছে তাসাওউফ বা সুফিবাদ। সুফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদ একই বিষয় নয়।

'তাসাওউফ' এর উৎপত্তি: পাপের পঙ্কিলতা ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্তিদানের জন্য এবং মানুষের মাঝে খোদার একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রচার করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ্তালা যুগে যুগে বহু পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন। এ সকল পয়গাম্বরদের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইমামুল আম্বিয়া হযরত রসূল করিম (দ.)। স্রষ্টার সকল রহস্যের মূল হচ্ছেন হযরত রসূল করিম (দ.)। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি যদি রসূল (দ.)-কে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে আসমান-জমিন, লৌহ-কলম, বিশ্বব্রহ্মান্ড কিছুই সৃষ্টি করতাম না"–(হাদিস-ই কুদ্সী)।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, "আমি আহাদ ছিলাম, মীমকে নিজের মধ্যে স্থান দান করলাম। মহব্বত ও ভালবাসাতে আহমদরূপে আত্মপ্রকাশ করলাম"–(হাদিসে কুদ্সী)।

সকল প্রকার ইবাদত বা উপাসনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল খোদা-প্রেম। প্রেম বা ভালবাসার উদ্দেশ্য হল খোদার সাথে মিলন বা খোদার দিদার লাভ এবং খোদার সঙ্গে মানবের মিলনের জন্য অহর্নিশ চেষ্টা সাধনা ও ব্যস্ততার নাম হচ্ছে ফানা বা আল্লাহ্র প্রেমে সমাহিত হওয়া। এ অবস্থায় মানবের কোন স্বীয় অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। খোদা-প্রেম মানবের জন্য পরম আরাধ্য বস্তু। রসূল (দ.)-কে সৃষ্টির মূলে রয়েছে খোদা-প্রেম, মিরাজ শরিফ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ এবং মহানবীর (দ.) পারস্পরিক প্রেমালিঙ্গনের অনিবার্য পরিণতি। হযরত ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী দেয়ার উদ্যোগ নেয়ার মূলে ছিল খোদা-প্রেম, কুহে তুরে হযরত মুসা (আ.) ভস্মীভুত না হয়ে বেহুশ হবার মূলে ছিল খোদা-প্রেম এবং মনসুর হাল্লাজ (র.) 'আনাল হক' বলার মূলেও ছিল খোদা-প্রেম। অতএব, এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সকল সৃষ্টির মূলে ছিল মহব্বত বা খোদা-প্রেম।

মহান আল্লাহ্‌তালার ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছেন হযরত রসূল করিম (দ.)। হযরত রসূল করিম (দ.) ও অন্যান্য পয়গাম্বরদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য পয়গাম্বরদেরকে মহান আল্লাহ্‌তালা পাঠিয়েছিলেন একটি বিশেষ গোত্র বা গোষ্ঠির সংস্কারক বা হেদায়তের পথনির্দেশকরূপে। কিন্তু হযরত রসূল করিম (দ.)-কে পাঠানো হয়েছে সারা বিশ্বের তথা সমগ্র সৃষ্টির আশীর্বাদ বা রহমতুল্লীল আলামীন নামে। হযরত রসূল (দ.) এর মধ্যে দুটো মহান ক্ষমতা ছিল। এ দুটো ক্ষমতার একটি হচ্ছে নবুয়ত এবং অপরটি হচ্ছে বেলায়ত। হযরত রসূল করিম (দ.) এর 'মুহম্মদ' নাম নবুয়তী শক্তির প্রতীক এবং 'আহমদ' নামটি বেলায়তি শক্তির আধার। নবুয়তী শক্তিটি ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরীল (আ.) মারফত মহান স্রষ্টা থেকে প্রাপ্ত শক্তি এবং বেলায়তী শক্তিটি হচ্ছে কোন মাধ্যম ছাড়া ইলহামের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা থেকে সরাসরিভাবে প্রাপ্ত শক্তি। নবুয়তী শক্তিটি হচ্ছে লোকজনকে ধর্মীয় বিধি বিধান এবং আচার আচরণ সংশ্লিষ্ট হেদায়েত দানের ক্ষমতা এবং বেলায়তী শক্তিটি হচ্ছে অজানাকে জানার, অদৃশ্যকে দেখার এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা। এই বেলায়তী শক্তি বলেই হযরত রসূল করিম (দ.) মিরাজ বা প্রভু-মিলনে ধন্য হয়েছিলেন, চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন, মরা গাছে ফল ফলিয়েছিলেন। হযরত রসূল করিম (দ.) এর এই বেলায়তী শক্তিই ইল্‌মে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। হযরত রসূল করিম (দ.)-এর মাঝে নবুয়ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর বেচাল প্রাপ্তির সাথে সাথে নবী প্রেরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেলায়তী শক্তির প্রবাহ হযরত নবী করিম (দ.) অব্যাহত রেখে যান। যেহেতু, কাফেরদের উদ্যত রোষ থেকে হযরত রসূল (দ.) কে রক্ষা করার মানসে হিযরতের রাতে হযরত রসূল করিম (দ.) এর পবিত্র বিছানায় হুজুর (দ.) এর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকে আত্মোৎসর্গের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় হযরত আলী (রা.) উত্তীর্ণ হন, সেহেতু হযরত আলী (রা.) হযরত রসূল করিম (দ.)–এর এ বেলায়তী শক্তি বা ইল্‌মে তাসাওউফের উত্তরাধিকারী হন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ প্রসংগে হযরত রসূল করিম (দ.)-এর মহান বাণী প্রণিধানযোগ্য, "আমি ইল্‌মে লদুন্নী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শহর এবং হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন তার দরজা।"

নবী প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেলেও এ ধরাধামে কিন্তু তমসার রাত কেটে যায়নি। হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, অনাচার, অবিচার, অনৈতিকতা, অমানবিকতা ইত্যাদি এ জগতে অব্যাহত রয়েছে। তাই নবীযুগের পর থেকে মহান আল্লাহ্‌তালা এ ধরা বক্ষে মানব সমাজের হেদায়েতের জন্য অলি প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ অলিগণই হচ্ছেন হযরত আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত বেলায়তী ক্ষমতা বা ইল্‌মে

তাসাওউফের ধারক ও বাহক। এ সকল অলি আল্লাহ্গণের কারো কারো দায়িত্ব কর্তব্য বা মর্যাদা কোন কোন যুগের অনেক নবীদের মর্যাদার চাইতেও আকর্ষণীয় বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে। এ সকল অলিগণ যুগ যুগ ধরে মানবজাতিকে কুরআন-হাদিস-সুন্নাহ্র আলোকে আলোর সন্ধান দিয়ে যাচ্ছেন অবিরত। তাই আমরা দেখতে পাই মানবজাতির ক্রান্তিলগ্নে গাউসুল আযম হযরত বড় পীর (ক.), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (ক.), হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.), গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মত মহান যুগসংস্কারক অলি-আল্লাহ্গণের আবির্ভাব ঘটেছে। অলিগণ হচ্ছেন খোদার সহচর বা বন্ধু। তাঁরা ইল্মে তাসাওউফের অধিকারী, খোদার নৈকট্য লাভকারী, রহস্য উদঘাটনকারী, লোভ-লালসা পরিত্যাগকারী, নিরলস সাধক এবং অনন্ত স্রষ্টার সাথে সসীম সৃষ্টির মিলনকারী।

কারো কারো মতে, 'সুফ' শব্দ থেকে সুফিবাদ বা তাসাওউফ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। হযরত রসূল করিম (দ.)-এর একদল সাহাবা ইসলাম গ্রহণের পর মসজিদে নববীর একটি নির্দিষ্ট পার্শ্বে উঁচু স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটাতেন। এ সকল সাহাবাদের সাথে হযরত রসূল (দ.) আল্লাহ্তালার রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন যা আরবের বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধারণ সাহাবাগণ বুঝতে সক্ষম হতেন না। এ সকল সাহাবাদেরকে তিনি তাঁর চাদর বা জামা মোবারক দান করে সম্মানিত করতেন। এ চাদর বা জামাকে নাকি 'সুফ' বলা হতো এবং 'সুফের' অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হতো 'আহলুস্ সুফ্ফা' বা চাদর পরিহিত ব্যক্তি। এ সম্মানিত সাহাবাদেরকেই সুফি বলা হতো। কেউ কেউ আবার কুফার জামী আবু হাসীম (রা.)-কে প্রথম সুফি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ সুফিদের থেকেই সুফিবাদ বা তাসাওউফের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কে প্রথম সুফি তা নিয়েও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ হযরত হাসান বসরী (র.)-কে প্রথম সুফি হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে, হযরত জামির বিন জায়না (রা.) হচ্ছেন প্রথম সুফি। প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ হযরত রসূল করিম (দ.)-এর নিকট নাযিল হওয়ার পর থেকেই সুফিবাদের উৎপত্তি হয়। সুফিবাদের উৎস হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.), যিনি ঐতিহাসিক হেরা-পর্বতের গুহায় মোরাকাবা-মোশাহেদা করতেন, ধ্যান করতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন। তিনি হেরার নির্জনে মহান আল্লাহ্তালার সান্নিধ্য হাসিল করার জন্য অবস্থান করে রূহানী খোরাক লাভ করতেন। হযরত রসূল করিম (দ.) বলেন, "আল্লাহ্র সাথে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমি আমার রবকে অত্যন্ত সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি" –(আল-হাদিস)।

মি'রাজের রাত্রিতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে আহমদ! আমার অত্যন্ত কাছে আসুন" –(হাদিসে কুদসী)।

ডঃ ইকবালের বাণীটিও এ প্রসংগে উল্লেখ্য। ডঃ ইকবালের ভাষায়, "মুসা (আ.) রবের সুরতে জামালী দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। আর রসূল (দ.) স্বীয় রবের দর্শনে মুচকি মুচকি হেসেছিলেন।" (Dr. Iqbal, the Renaissance of Islam)

সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ্তা'লা হযরত রসূল করিম (দ.) কেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, তিনিই এ বিশ্বজগতের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি। বস্তুতঃ মি'রাজের রাত্রিতে মহান আল্লাহ্তালার সাথে রসূল (দ.) এর যে নব্বই হাজার কালাম বা বাক্য বিনিময় হয়, ঐ নব্বই হাজার কালামের মধ্যে গুপ্ত ষাট হাজার কালামই হচ্ছে তাসাওউফের মূল খণি এবং এ খণির আহরণকারী হচ্ছেন অলিগণ। হুজুর (দ.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সময়কালের অনন্ত বিখ্যাত অলি এবং সুফি হচ্ছেন হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ)।

তাসাওউফের গুরুত্বঃ রূহানীয়তের ধর্ম ইসলাম যখন প্রাণহীন ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, সমাজের ধর্মের বন্ধন যখন শিথিল হয়ে পড়ে এবং জড়বাদীতার প্রভাব যখন বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন ধর্মকে প্রাণময় করার জন্য তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাসাওউফ মানবকে অর্থ, যশ প্রভৃতির প্রভাব বা মোহ থেকে মুক্ত করে মানুষের মনে খোদা ও রসূলের প্রেম জাগিয়ে তোলে এবং মানুষকে খোদার নির্দেশ মান্য করার পথে আকৃষ্ট করে। প্রকৃতপক্ষে, যাদের হৃদয়ে তাসাওউফ তথা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেম স্থান পায়, তারাই কুরআন-হাদিসের নির্দেশিত ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ পালন করতে হলে মানুষের হৃদয় নফ্স ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে এবং খোদার সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, "যার আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, সে মানুষ বলে গণ্য হয় না" (এহ্হিয়া উলুমুদ্দীন)।

ইল্মে তাসাওউফ হলো ইসলাম ও ঈমানলব্ধ জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া বাহ্যিক জ্ঞান অচল। সূর্য বা আলো না থাকলে চোখের জ্যোতি দিয়ে যেমন কিছু দেখা যায় না, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া বাহ্যিক জ্ঞান বিশ্ব জগতের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে অক্ষম। মাওলানা রূমী (র.) বলেন, "জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু সংশয় ও দ্বিধা বর্ধিত করে, পক্ষান্তরে দ্বীন-ইসলাম ও ঈমানলব্ধ জ্ঞান উর্ধের উর্ধে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়।" তাই বিশ্ববাসীকে মাওলানা রুমী (র.) বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে

সীমিত না থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "কতকাল গ্রীক-বিজ্ঞানের পড়াশুনা করবে? ঈমানী বিজ্ঞানের পড়াশুনাও করে দেখ।"

কুরআন, হাদিস এবং শরীয়ত চর্চা ও উহার গবেষণা থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরম্ভ হয়। ইমাম হযরত আবু বকর শিবলী (র.) হযরত রসূল করিম (দ.) এর রওজা শরীফ থেকে গায়েবী আওয়াজ শুনলেন, "শিবলী! কেবল বাহ্যিক জ্ঞান তোমার জন্য যথেষ্ট নয়। বাগদাদে আমার প্রিয় হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) এর নিকট গিয়ে ইল্‌মে তাসাওউফ অর্জন কর।"

বলা বাহুল্য, হযরত শিবলী (র.) বাহ্যিক জ্ঞানের খণি হিসেবে হুজ্জাতুল ইসলাম উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কাজী সানাউল্লাহ্ (র.) তাঁর এরশাদুত্ তালেবীন কিতাবে ইল্‌মে তাসাওউফ শিক্ষাকে ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, ইল্‌মে তাসাওউফ শিক্ষা যে একান্ত জরুরী এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই তো হযরত মুসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) কে বললেন, "যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনার কাছে থাকি এ শর্তে যে, যে গুপ্ত বিদ্যা আপনাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা থেকে সামান্য আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন" –(সূরা কাহাফ আয়াত ৬৬)।

কেউ কেউ মনে করেন, ইসলাম বহির্ভূত কিছু মনীষীর আদর্শ সুফিবাদকে প্রভাবিত করেছে। খ্রিস্টিয় কৃচ্ছ্রতা সাধনব্রত, গৌতম বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব, নয়া প্লেটো তত্ত্বসমূহ (Neo-Platonic Theories) এবং বিভিন্ন দার্শনিকের লেখা সুফিবাদকে প্রভাবিত করেছে বলে অনেক পন্ডিত ব্যক্তির ধারণা। তাই অনেক গোঁড়া মুসলমান সুফিবাদের উৎস সম্পর্কে অবহিত না হয়ে এখনও সুফিবাদকে অ-ইসলামী বলে সমালোচনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সমালোচনা ভিত্তিহীন। সুফিবাদ বা তাসাওউফ হচ্ছে ইসলামের বাস্তব দিক এবং এটা কোন কল্পনাপ্রসূত নিছক মনগড়া ধারণা নয়। সুফিবাদ নিস্তব্ধতার মাধ্যমে রহস্য জগতের রহস্য উদঘাটনে সত্যান্বেষী মানুষকে সহায়তা করে। সকল রহস্যের মূল হচ্ছেন আল্লাহ্, হযরত রসূল করিম (দ.) এবং আহলে বাইতগণ। রসূল করিম (দ.) এবং তাঁর আহলে বাইতগণের জীবনের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে আধ্যাত্মিক বা রহস্যময় দিক, যা সর্বোচ্চ নৈতিকতার গতি নির্দেশক। তাঁদের আধ্যাত্মিক দিক তাঁদের অন্তরের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধনে নিবেদিত ছিল।

অন্তরের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ তখনি অর্জিত হয়, যখন মানুষের স্বার্থপরতা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত হয়। সুতরাং, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা মানব কল্যাণ সুনিশ্চিত করার মুখ্য উদ্দেশ্যটির সাথে সুফিবাদের কোন বিরোধ

নেই। বরঞ্চ সুফিবাদই হচ্ছে ইসলামের বাস্তব দিক এবং নির্যাস স্বরূপ। একজন খাঁটি মুসলমান ইহজগত এবং পরজগতের সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিসটি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং দোযখের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্রষ্টার সাহায্য কামনা করে। একজন ব্যক্তি যদি মানব মনের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ন্ত্রিত করে গভীরভাবে ধ্যান করে, তবে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির প্রার্থনার আসল তাৎপর্য কি সেটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি সত্ত্বাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মানবের সামগ্রিক কল্যাণে ব্রতী হওয়াটাই যে প্রার্থনার আসল উদ্দেশ্য, সেটা বুঝতে সক্ষম হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ইল্‌মে তাসাওউফের মাধ্যমে অর্জিত সুউচ্চ নৈতিক মানবিক মূল্যবোধের বলেই অত্যন্ত শুদ্ধ জীবনবাদী সুফিগণ গোটা বিশ্বে ইসলামী বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। এতটুকু গোঁড়ামীর সেখানে স্থান নেই। ইসলাম নিছক জাগতিক মুক্তির ধর্ম নয়। ইসলাম মানব জীবনের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের ধর্ম। আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানবাত্মাকে সুষমামণ্ডিত ও সুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য রূহানী ও ঈমানী খোরাক যোগায়। তাসাওউফের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ অর্জন। অন্তরের উৎকর্ষ সাধিত হলে বাস্তব জগতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত হবে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন কিংবা দর্শন স্পৃহা মানুষের একটি অনন্তকালের শাশ্বত স্পৃহা। এ স্পৃহাকে বাস্তবে রূপদান করাই হচ্ছে তাসাওউফের মূল লক্ষ্য। মানুষ যখন স্রষ্টার দর্শন লাভের অবস্থায় উপনীত হয়, তখন ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং খোদার প্রতি নির্ভরশীলতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির দূরত্ব তিরোহিত হয়, পর্দার আড়াল সরে দাঁড়ায়। হযরত রসূল করিম (দ.) থেকে বিচ্ছুরিত আলোকের অনুসরণ করে বিভিন্ন স্টেশন কিংবা মোকাম অতিক্রম করে খোদার নৈকট্য হাসিল করাই তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌তালার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য হাসিল সম্ভবপর হয়। আল্লাহ্‌তালার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ তখনি সম্ভবপর হয়, যখন কোন মুসলমান খোদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌তালার প্রতি তার পবিত্র দায়িত্ব পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে পালন করে। একজন সুফির কাছে লোক দেখানো ভালবাসাহীন আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতা অপেক্ষা ভালবাসাপূর্ণ কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা অনেক বেশী মধুর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ওহে মানবগণ! তোমাদের প্রভুর পথে পরিশ্রম কর এবং কষ্টের সাথে পরিশ্রম কর এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাবে" –(সূরা ইনশিকাফ আয়াত ৬)। সুফিদের অন্তর খোদার ভালবাসায় পরিপূর্ণ। প্রভুর বিচ্ছেদে সুফিগণ দোযখের কষ্ট অনুভব করে এবং প্রভুর মিলনে তারা স্বর্গীয় সুখ পায়। এ কারণেই সুফিগণ প্রকৃত জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং জ্ঞান তাদেরকে নিছক পার্থিব স্বার্থপরতা, লোভ হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে

খোদার প্রতি নিবেদিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। আর খোদার প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামের পরিপূর্ণতার স্তর। ইলম-ই-মারিফাত আয়ত্ত করতে পারলে মানব হৃদয় পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে সে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালা বলেন, "আমি গুপ্ত ছিলাম, ভালাবাসার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে চাইলাম। সুতরাং; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীব ও প্রাণীকুল সৃষ্টি করলাম যাতে করে আমি প্রকাশিত হতে পারি" –(হাদিস-ই-কুদ্‌সী)।

মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালার উপরোক্ত বাণীটি ব্যাখ্যা করলে তিনটি বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়: (১) মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালা সবকিছু ভালাবাসা থেকে সৃষ্টি করেছেন। (২) তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে যে সকল সৃষ্টির বিবেক রয়েছে সে সকল সৃষ্টি তাদের স্রষ্টা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। (৩) একমাত্র স্রষ্টাই বাস্তব সত্য এবং তিনিই চূড়ান্ত ও অতুলনীয়।

স্রষ্টা যেহেতু অতুলনীয়, সুতরাং তিনি অতুল্য উত্তম ও সুন্দর। সৌন্দর্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রকাশ প্রবণতা। গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালার এই প্রকাশ প্রবণতারই ফলশ্রুতি। সুতরাং, যা কিছু দৃশ্যমান তা এই অতুল্য চূড়ান্ত সুন্দর ও বাস্তব সত্ত্বারই প্রতিফলন মাত্র। এতেই প্রমাণ হয় যে, সসীম সৃষ্টিরাজি বিকশিত হওয়ার পূর্বে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে এবং প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হবার পর সসীম সৃষ্টিরাজি অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে। "আমরা আল্লাহ্‌তালার নিকট থেকে এসেছি এবং আল্লাহ্‌তালার কাছেই ফিরে যাব" –(সূরা বাক্বারা, ১৫৬ আয়াত)। উপরোক্ত আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, সসীম সৃষ্টি পৃথিবীতে আসার সময় নিম্নগামী ভ্রমণ (নুযুল) শুরু করে এবং জীবন শেষে ঊর্ধগামী ভ্রমণের (উযুল) মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে ফিরে যায়। এ বাক্যটিকে সম্প্রসারণ করলে সৃষ্টি জগতের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ সসীম সৃষ্টি সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নে এবং সর্বনিম্ন থেকে পুনরায় সর্বোচ্চ মকামে পদার্পণ করে। সুফিদের মতে, সসীমের সাথে অসীমের মিলনই হচ্ছে চূড়ান্ত মিলন (Supreme Union)। একমাত্র ভালবাসার মাধ্যমেই এই চূড়ান্ত মিলন সম্ভবপর হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই চূড়ান্ত মিলনই একজন সুফির কাছে সবচেয়ে বেশী কাম্য।

মহান আল্লাহ্‌তালা যেহেতু তাঁর বান্দাগণকে সত্যপথে পরিচালনা ও তাঁর দর্শন লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, সেহেতু তিনি কষ্ট স্বীকারকারী তাঁর মাশুকদেরকে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। প্রিয় নবী হযরত রসূল করিম (দ.) এর জীবনাদর্শই হচ্ছে এই সঠিক পথ। কারণ রসূল (দ.) এর জীবন ছিল খোদার ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং রসূল (দ.) কে সৃষ্টি করা হচ্ছে খোদার ভালবাসার পরিপূর্ণ প্রতিফলন। কারণ, রসূল

(দ.) কে মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালা সারা দুনিয়ার রহমতরূপে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ্‌তালা বলেন, 'হে মাহবুব! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আমার মোহাম্মদ (দ.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ কর, কেবল তখনি আল্লাহ্‌তালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন' -(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩১)। মহান প্রভু আরও বলেন, "রসূল নিজের থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর মুখ থেকে যা কিছুই বের হয়, তা সবই আল্লাহ্‌র বাণী" -(সূরা নজম, আয়াত ৩-৪)। সুতরাং, রসূল (দ.) কে যদি কেউ নিজের জীবন থেকে বেশী ভালবাসে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তবে সে সঠিক পথে পরিচালিত হবে, খোদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। খোদার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং খোদার চূড়ান্ত দর্শন লাভে সক্ষম হবে। মহান প্রভু আল্লাহ্‌তালা হচ্ছেন ইল্‌ম-ই-মারিফাতের স্রষ্টা এবং আহলে বাইতগণ হচ্ছেন তার বিকাশধারা। সুফিগণ বিশ্বাস করেন যে, রসূল (দ.)-এর আহলে বাইতগণকে ভালবাসলে এবং তাঁদের জীবনাদর্শকে (যা রসূল (দ.)-এরই জীবনের প্রতিফলন) অনুসরণ করলে রসূল (দ.) ও আল্লাহ্‌তালার ভালবাসা পাওয়া যাবে। হাদিস শরীফে আছে, "আল্লাহ্‌তালা তোমাদেরকে দান হিসেবে (ভালবাসা ও সন্তুষ্টি থেকে) যা দিয়েছেন, সে কারণে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে হলে আমাকে [রসূল (দ.) কে] ভালবাস এবং আমার ভালবাসা পাবার জন্য আমার আহলে বাইত (রা.) কে ভালবাস" (তিরমিযী)। সুফিগণ তাই পবিত্র কুরআন মজিদ, রসূল (দ.) এবং তাঁর আহলে বাইতগণকে ইল্‌ম-ই-মারিফাত তথা জ্ঞানের অনন্ত প্রস্রবন হিসেবে পরিগণিত করে থাকেন যার ফল্গুধারা অদ্যাবধি বিভিন্ন তরীকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তাসাওউফের ভূমিকাঃ একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুফিবাদের অবদান অপরিসীম। সুফিবাদ যে কোন বস্তুকে গুণগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামের সত্যিকারের রূপ। সুতরাং, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুফিবাদী দর্শনেরই বাস্তব প্রতিফলন। সুফিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা পাশ্চাত্যের ধনবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুফিবাদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা প্রবৃদ্ধি নিছক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং কারিগরী প্রগতির ফলশ্রুতি নয়। সুতরাং, সুফিদের দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলতে বুঝায় মানবের উন্নয়ন তথা তার দৈহিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন। সুফিরা বিশ্বাস করে যে, মানুষ হচ্ছে পরিবর্তনের সক্রিয় প্রতিনিধি। তাই মানবিক মূল্যবোধ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "যে জাতি

নিজের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহ্‌তালা তার অবস্থা পরিবর্তন করেন না" –(সূরা রা'দ, আয়াত ১১)।

সুতরাং, এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় কাঠামোর নির্দেশনা অনুযায়ী একজন মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে দায়বদ্ধ। সুফি দর্শন বিশ্বাস করে যে, যদি জনগণের চিন্তাধারার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা যায়, তবে সহজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। সাধারণতঃ মানুষের আত্মা, হৃদয়, প্রবৃত্তি, মানসিকতা প্রভৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধনের দ্বারা চিন্তাধারার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা যায়। সুফিবাদের কাঠামোর অধীনে উন্নয়ন হচ্ছে একটি বহুমুখী কর্মকাণ্ড যা গুণগত ও পরিমানগত উভয় প্রকার পরিবর্তনকে বুঝায়। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিনিয়োগ ও কারিগরী প্রগতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনের গুণগত দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। সুফিবাদ গুণগত ও পরিমানগত দিকের এ ভারসাম্যহীনতাকে দূর করতে চেষ্টা করে। সুফিবাদের প্রধান দিক হচ্ছে গুণগত দিক। সুফিবাদ মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপকে সামগ্রিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধারণা অনুযায়ী সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি সর্বাধিকরণ। এ ধরনের পাশ্চাত্য ধারণা মানুষকে স্বার্থপর হিসেবেই চিহ্নিত করে এবং এটাকে অপরিবর্তনীয় মনে করে থাকে। একজন খাঁটি সুফি এ ধরনের অনুমানকে অস্বীকার করে। কেননা মানুষের স্বার্থপরতা স্বভাবটি সমাজে অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। তাছাড়া সর্বাধিক অভাব মোচনের পাশ্চাত্য ধারণাটি সুফিবাদ অনুমোদন করে না। কেননা এ ধরনের প্রবৃত্তি ঘোড় দৌড়ের মত, যা কখনও শেষ হবে না। যেহেতু সুফিবাদ মানুষের গুণগত দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, যেহেতু সুফিবাদ ইহ ও পর জগতে 'ফাতাহ্‌' অর্জনের নিমিত্তে বিভিন্ন উপায় বাতলিয়ে দেয়। ইহজগতে ফাতাহ্‌ বলতে তিনটি জিনিসকে বুঝায়ঃ (১) বেঁচে থাকা; (২) অভাব থেকে মুক্তি; (৩) ক্ষমতা ও সম্মান। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আমি সৃষ্টি জগতের জন্য উপজীবিকা সৃষ্টি করেছি" –(সূরা হিজর, আয়াত ২০)।

সুতরাং, দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। পবিত্র কুরআনে মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এ বাণী থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। যেহেতু খোদাতালা দুনিয়াতে পর্যাপ্ত সম্পদের সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মানুষের দারিদ্র ভোগ করার কথা নয়। বর্তমান বিশ্বে যে দারিদ্রের কষাঘাত চলছে, তা সম্পদের অপব্যবহার ও অপবন্টনের ফল। সুতরাং, মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হলে সম্পদের সুষম বন্টন সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিবাদের দৃষ্টিতে উন্নয়ন হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যধর্মী মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড। সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুফিবাদ দু'টো জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেঃ (১) সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করা; (২) সম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করা। অন্যথায় মানুষকে আখিরাতে খোদার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সুফিবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি অধিকার স্বীকার করে বটে, তবে তা শর্তহীন কিংবা চূড়ান্ত নয়। একটি বাস্তবসম্মত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় তজ্জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,–'সম্পদ যেন ধনী লোকদের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়' –(সূরা হাশর, আয়াত ৭)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী চিন্তাধারা বন্টনের এ গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছে। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উৎপাদন। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ সম্পত্তির উপর শর্তহীন ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করে যা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঞ্ছিত নয়।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে তিনটি যথাঃ জমি, শ্রম এবং পুঁজি। অন্যদিকে ধনবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে চারটি যথাঃ জমি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। সুতরাং, যিনি সম্পদের মালিক তিনি তার ব্যবস্থাপনার ভার স্বয়ং নিজে গ্রহণ করেছেন। মানুষ হচ্ছে উক্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যম বিশেষ। সঠিক উৎপাদন, কাম্য উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের কাম্য ব্যবহারের জন্য পবিত্র কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ্‌তালা নির্দেশনা ও সীমারেখা প্রদান করেছেন এবং উক্ত নির্দেশনা মডেলকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে রসূল করিম (দ.) তার প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন। একজন সুফির জীবন হচ্ছে রসূল (দ.)-এর সুন্নাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। অতএব, সুফি কর্তৃক পরিচালিত জীবন ব্যবস্থার অনুসরণই একটি দেশের জন্য কাম্য উৎপাদন এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে পারে।

সুফিদের নিকট মানুষের অভাব অসীম নয়। কারণ, সন্তোষই হচ্ছে সুফিদের পরম ধন। সুফিদের মতে, সাধনা ও একাগ্রতার দ্বারা মানুষের ষড়রিপু যথাঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আত্মা ও মনের উন্নতি ঘটবে এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষ এমন একটি স্তরে উপনীত হবে যখন মানুষ মৌলিক সমস্যার (যেমনঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি) সমাধান লাভ করলে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। যা না হলে চলে, তা পাওয়ার জন্য তার মনে কোন ক্ষোভ থাকবে না। তাছাড়া সুফিদের দৃষ্টিতে যে সকল বস্তু মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় কিংবা প্রয়োজনীয় নয় তা

বর্জন করা উচিত। সুফিবাদে আলস্য কিংবা বসে খাওয়ার সুযোগ নেই। “নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত কর সবে” এই হচ্ছে সুফিদের জীবনের চলার পথে প্রধান মূলমন্ত্র। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাকার নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এ যুগে সুফি অনুসৃত জীবন ব্যবস্থা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। বলা বাহুল্য যে, সুফি জীবন ব্যবস্থা মানুষের আর্থিক, নৈতিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দিকগুলোর প্রতি সন্ধানী আলো ফেলে।

তাসাওউফ আয়ত্ব করার উপায় এবং তাসাওউফের সাথে কামিল অলির সম্পর্ক: মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র.) এর মতে ইল্‌মে তাসাওউফ অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো মেনে চলতে হবেঃ

(১) আল্লাহ্‌র সংগে পুনর্মিলনের জন্য মানবাত্মার অবিশ্রান্ত ক্রন্দন; (২) নবী করিম (দ.)-এর প্রতি অসীম ভালবাসা পোষণ করা; (৩) আউলিয়া-ই কিরামের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রসূল (দ.)-এর প্রেম হাসিল করা; (৪) আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য সর্বজনীন প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করা; (৫) পীর বা দীক্ষাগুরুর সমীপে যাওয়া; (৬) দুনিয়ার মধ্যে থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করা; (৭) প্রেম ও আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক যুক্তির অবতারণা স্বীকার করা; (৮) প্রকাশ্যভাবে জিকির-আজকার করার সময় আধ্যাত্মিক সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের আশ্রয় নেয়া; (৯) খোদার একত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া। মাইজভাণ্ডারী দর্শন অনুযায়ী প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ‘সপ্ত পদ্ধতি’ অনুশীলনের মাধ্যমে তাসাওউফ শক্তি অর্জন করা যথাঃ (১) আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া; (২) অনর্থ পরিহার করা; (৩) স্রষ্টার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া এবং স্রষ্টার কার্যকারণে সন্তোষ প্রকাশ করা; (৪) রোজা, উপবাস ইত্যাদির মাধ্যমে সংযমের অভ্যাস করা; (৫) আত্ম-সমালোচনা করা; (৬) লালসা থেকে মুক্ত হওয়া; (৭) নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

উপরোক্ত শর্তসমূহ পালন করে খোদার নৈকট্য লাভ করার জন্য কামিল অলির সান্নিধ্য একান্ত অপরিহার্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, খোদার নৈকট্য লাভ করতে হলে খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কারণ, খোদা হচ্ছেন আমাদের প্রিয়তম মাশুক। কিন্তু খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা সহজ কাজ নয়। কেননা খোদা নিরাকার। তাঁর কোন রং, রূপ বা আকৃতি নেই। কাজেই খোদার সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে মাধ্যম বা ওয়াসীলা তালাশ করতে হবে। এ মাধ্যম বা ওয়াসীলা হচ্ছে প্রেমিক অলি বা কামিল পীর। মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে মোমিনগণ, তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং তাঁকে চিনবার জন্য ওয়াসীলা (পীর) গ্রহণ কর। তার পথে প্রাণপণ চেষ্টা কর যাতে তোমারা সুফলপ্রাপ্ত হও” –(সূরা মায়িদা আয়াত ৩৫) হযরত

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন, "ওহে বেখবর! তুমি যদি আল্লাহ্‌র সাথে মিশতে চাও, তবে চিরতরে কামিলদের পায়ের ধূলা হয়ে যাও" –(এহ্‌হিয়া উলুমুদ্দীন)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রেমিক অলি বা কামিল পীর ভিন্ন খোদাকে পাবার, চিনবার ও জানবার উপায় সুকঠিন। হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, "যে ব্যক্তির মুরশিদ নেই, তার মুরশিদ শয়তান"। প্রকৃতপক্ষে কামিল অলির সান্নিধ্য ছাড়া মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করা সহজ নয়। তাই কামিল পীরের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং পীরের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে খোদাকে পাওয়ার পথ সুগম হবে এবং খোদা প্রেমিক হওয়া যাবে। কামিল পীর তিনি যিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিশে আল্লাহ্‌র ভেদ লাভ করতে সক্ষম হন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মানব আমার ভেদ, আমি মানবের ভেদ" –(হাদিস-ই কুদ্‌সী)।

কামিল পীর খোদা-প্রেমের অনুরাগী এবং খোদার নূরে পাগল। তিনি খোদার প্রেমাগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে নিজেকে ফানা বা ধ্বংস করে দেন। তাই খোদার কুদরত তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে বাঘ, ভালুক, সাপ-বিচ্ছু সব কিছু তাঁর অনুগত হয়ে যায়। এ প্রসংগে হযরত বড় পীর (ক.) এর "ফতুহুল গায়ব"-এ বর্ণিত হাদিসটির উল্লেখ করা যায়, "মোমিন বান্দা যখন রেয়াজত ও নফল ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অনুসন্ধান করেন, আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁকে প্রিয়ভাজন করেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর দর্শনশক্তি হয়ে যান, তাঁর শ্রবণশক্তি হয়ে যান এবং তাঁর হস্ত-পদ হয়ে যান।" তাই গভীর অরণ্যে হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে বাঘ পাহারা দিয়েছে, হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) এর আঙ্গুল মোবারক বাঘ লেহন করেছে এবং তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য বিরাটকায় হাতী থমকে দাঁড়িয়েছে। মাওলানা রুমী (র.) বলেন, "কামিল পীর আল্লাহ্‌কে দেখার দর্পণ বিশেষ। তাই পীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে খোদার প্রেমালোকে আত্মা উদ্ভাসিত হয়, অন্তর স্বচ্ছ আয়নার মত পরিষ্কার হয় এবং খোদার সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। রসূল (দ.) বলেন, "মোমিন ও কামিল লোকদের দিল আল্লাহ্‌তালার আরশ বা সিংহাসন"। মসনবী শরিফে মাওলানা রুমী (র.) আরও বলেন, "মোমিন ও কামিলের দিল হাসিল কর। এটা তোমার জন্য হজ্বে আকবর। হাজার হাজার কাবা অপেক্ষা শয়তানী স্বভাবমুক্ত একটি অন্তর শ্রেষ্ঠ" (মসনবী)। মুরশিদ প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন কবি হাফেজ সিরাজী (র.)। তিনি তাঁর মুরশিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাকে এমনি ছেড়ে দেব না। আমার জানাযায় তুমি না আসলেও আমার মাজারে হলেও তোমাকে আসতে হবে" (দিওয়ানে হাফেজ সিরাজী)। অলিগণ হচ্ছেন খোদায়ী প্রেম-প্রেরণাসমৃদ্ধ আত্মা বা রূহের

অধিকারী। আল্লাহ্তালার ইশ্ক-মহব্বত হৃদয়ে জাগাতে হলে অলিদের শিষ্যত্ব বা বাইত গ্রহণ করতে হবে। কামিল পীরের দর্শন লাভ করলে খোদার কথা স্মরণ হয়। কারণ, কামিল পীর হল খোদার নূরের ছায়া বিশেষ। তাই ভক্তিভরে পীরের সামনে বসলে খোদার জন্য ভক্তি ও প্রেমের স্পন্দন হৃদয়ে অনুভূত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "প্রকৃত ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার হৃদয়ে রূহানী আকর্ষণের প্রভাব সক্রিয়। ফলে মুরীদ সর্বদা খোদা ও রসূলের ধ্যানে বিভোর থাকেন ও দুঃখ-কষ্ট ভুলে যান। মুরিদের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায় (তাফ্সীরে এনায়ে কাছি)। মাওলানা রুমী (র.) বলেন, "ক্রুশ ও খ্রিস্টান জগত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, সেখানে খোদাকে পেলাম না। পূজা মণ্ডপ ও বৌদ্ধ মঠে গমন করলাম, সেখানেও তাঁকে পেলাম না। হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করলাম, তিনি সে উপত্যকার মধ্যেও নেই। কামিল অলির অন্তরে তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি অন্য কোন খানে নেই (মসনবী)।" কামিল অলি বা পীরদের প্রভাব তাঁদের ওফাতের পরও সমানভাবে কার্যকরী। কুরআন পাকে ঘোষণা দেয়া হয়েছেঃ "যাঁরা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত মনে করোনা, বরং তাঁরা জীবিত"। তাই হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর পীর ভাই সৈয়দ আহছান উল্লাহ্ (র.) মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.)-এর ওফাতের বহু বৎসর পর হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.)-কে মাজার শরীফে শায়িত অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত রত দেখতে পেয়েছেন।

হযরত রসূল করিম (দ.) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহ সবুজ বর্ণের পাখীর মধ্যে থাকে। এ সকল পাখীর বাসস্থান খোদার আরশের নীচে দোলায়মান রয়েছে" (শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, মানতিকুত তোয়ায়ের)। এ বাণী থেকে বুঝা যায়, আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অবিনশ্বর। অনুরূপভাবে, খোদার পথে যাঁরা আমিত্বকে বিলীন করে দিয়েছেন তাঁদের মৃত্যু নেই, তাঁরা জীবিত তুল্য। হযরত রসূল করিম (দ.) এর পরে কামিল অলিগণই হচ্ছেন প্রকৃত ধর্মপথের দিশারী। ইসলাম ধর্মের মূল হলো তাওহীদ। আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্তালার এ তাওহীদ প্রচারে অলিগণ নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কামিল অলি বা সুফি সাধকগণ চারটি স্তর যথাক্রমে (১) অদৃশ্য বস্তুর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান), (২) অদৃশ্য বস্তুর অনুসন্ধান (তলব), (৩) ইরফান বা অদৃশ্য বস্তুর পরিচিতি লাভ, (৪) অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে বিলীন হওয়া (ফানাফিল্লাহ্) অতিক্রম করে খোদার দিদার লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য তালিম দিয়ে থাকেন।

পরম পরিতাপের বিষয়, সুফি নাম ধারণকারী তথাকথিত অনেক পীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন। তারা তাদের শিষ্যদেরকে শুধুমাত্র কিছু বাঁধাধরা নিয়মকানুন শিক্ষা এবং কিছু মনগড়া দীক্ষা দানের মধ্যেই তাদের কাজকর্ম ও কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাদের কাজকর্ম আজ অনেকটা যান্ত্রিক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু তথাকথিত পীরকে বিভিন্ন প্রকার নৈতিকতা বিবর্জিত কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। অনেক ভণ্ড পীর পীরগিরিকে ব্যবসাবৃত্তিতে পরিণত করেছে। ফলে আজ আসল-নকলের মধ্যে ফারাক করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে এবং তথাকথিত পীর কিংবা তথাকথিত সুফিবাদ সম্পর্কে মানুষ বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। যে সুফিবাদ ইসলামের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং যে সুফিবাদ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সুনিশ্চিতকারী, সে সুফিবাদকে একটি অলীক ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরের একটি বস্তু বলে কোন কোন মহল চলন-বলনের দ্বারা প্রতীয়মান করার প্রয়াস পাচ্ছে। তাই আজ সত্যিকার পীর এবং সুফি সাধনার স্বরূপ জনগণের কাছে তুলে ধরা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সুফিগণকে যদি কেউ বর্তমান সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে থাকে, তবে তা হবে নিছক ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, সুফিগণই সভ্যতার উন্নয়নে কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন। হাজার হাজার সুফি সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক ও পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে সুফিগণই সৃষ্টির রহস্যকে উদঘাটন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহান সুফি ইল্‌ম-ই-মারিফাতের দরজা হযরত আলী (রা.), পীরানে পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.), শেখ হাসান বসরী (র.), হযরত রাবেয়া বসরী (র.), খাজা বাবা, সৈয়দ বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী (র.), শেখ আহমদ শারহিন্দী (র.), হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবাজান কেবলা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রমুখ সুফিগণ কেবলমাত্র বড় বুজুর্গ এবং ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, অনেকেই বিখ্যাত কবি, বক্তা এবং লেখকও ছিলেন। তাঁদের মূল্যবান লেখা, বাণী ও কাব্যগাথা এখনও বিশ্বের কবি সাহিত্যিকদের প্রেরণার উৎস। এ সকল সুফি সাধকগণ তাঁদের সাফল্যের দ্বারা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সুফিবাদ কোন কাল্পনিক মনগড়া পদ্ধতি নয়, বরঞ্চ এটা হচ্ছে ইসলামী বিধি ও রীতি নীতিসম্মত জীবনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তব অনুশীলন। প্রকৃতপক্ষে, উন্নত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একজন খাঁটি মুসলমানকে সুফি বলা যেতে পারে।

তাসাওউফের বিকাশে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অবদানঃ নবুয়ত যুগের পর নানা বিবর্তনের মধ্যে যখন ধর্মের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম বিশ্ব নানাবিধ বাধা ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়, তখন মহান আল্লাহ্তালা পীরানে পীর হযরত

আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে মুহীউদ্দিন বা ধর্মকে পুনরুজ্জীবিতকারী উপাধি দিয়ে এবং বেলায়েতে ওজমার অধিকারী করে প্রথম গাউসুল আযম ও কুতুবুল আকতাব রূপে যুগোপযোগী ধর্ম সংস্কারক হিসেবে এ ধরাধামে প্রেরণ করেন। এটা নবুয়ত সমাপ্তির প্রায় পাঁচশত বৎসর পর ধর্মীয় মত বিরোধী যুগের প্রথম দাওরা বা বৃত্ত। একই সময়ে সুলতানুল হিন্দ হযরত গরীব নওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীও (ক.) হযরত বড় পীর (ক.) এর মধ্যস্থতায় ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে কুতুবুল আকতাব বিল অসালাত ও বিল বিরাসত গাউসিয়তের শান নিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে যুগ-সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হন। এ সময়ে হযরত বড় পীর (ক.)-এর নিকট থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত ও তাঁর প্রভাবে পরিচালিত আরও অনেক “উলিল আমর” অলি এ মহান যুগ-সংস্কারের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। হযরত বড় পীর (ক.) এর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত এ সংস্কার যুগকে বেলায়তে মোকাইয়েদায়ে মোহাম্মদী (অর্গলযুক্ত প্রেমবাদ তথা বিধি বিধানের আনুকুল্য নির্ভর) যুগ বলা হয়। এ যুগে সুফিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে। এ যুগের অবসানের প্রায় ছয় শতাধিক বৎসর পর সময়ের ব্যবধানে ইসলামী হুকুমতের বিলুপ্তির ফলে ইসলামী জগতে নানা ইখলেতলাফ বা মতানৈক্য পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীতে নিমজ্জিত হয়ে গোটা বিশ্ব চরম নৈতিক অবনতির সম্মুখীন হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ, স্বৈরাচার, পার্থিব লোভ-লালসা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, খুন-খারাবী, ছিনতাই, সন্ত্রাস, ধর্ষন, লুণ্ঠন, মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা প্রভৃতি নৈতিক অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে গোটা মানব সমাজ পঙ্কিলতার চরম সীমায় উপনীত হয়। ধর্ম, যুগ ও জাতির এই মহাসন্ধিক্ষণ ও ক্রান্তিলগ্নে পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মানব সমাজকে উদ্ধারকল্পে এবং সুফিবাদের বাধাহীন বিকাশের লক্ষ্যে মুক্তির দিশা দেবার জন্য, মানব সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার স্বার্থে এবং ধর্মের সত্যিকারস্বরূপ পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসুল আযমরূপে এ ধরাধামে আবির্ভূত হন। তিনি যুগের প্রয়োজন অনুসারে শরীয়তী বিধি-বিধানের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের নৈতিকতার উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মীয় সহাবস্থানের সমর্থক ‘বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী’ বা ‘অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদী যুগে’র প্রবর্তন করেন। এ যুগ হচ্ছে সুফিবাদের চরম বিকাশ-উৎকর্ষের যুগ। এ যুগ ধর্ম-জগতের ও সমাজ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশিষ্ট যুগ। এই অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদ একটি মহান শক্তি যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, যা জজব ও ছলুকের সংমিশ্রণে এর অধিকারীকে নবী করিম (দ.)-এর পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের

যুগলরূপে বিকাশ দান করতে এবং হাদিয়ে মাহ্‌দীরূপে হযরত ইসা (আ.) এর বেলায়তী স্বরূপকে একত্রে সমাবেশ করতে সক্ষম। মাওলানা রূমী (র.) বলেন, “হে পথের সন্ধানী! তোমরা জেনে রাখ, তিনিই প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং হেদায়েতকারী যাঁর দৃষ্টি দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুতে একই সমান” (মসনবী)। অর্গলমুক্ত প্রেমবাদ একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তী শক্তি। এটি বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। এটি মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক। বলা বাহুল্য, ‘মাইজভাণ্ডারী দর্শন’ হচ্ছে এই অর্গলমুক্ত প্রেমবাদেরই ফলশ্রুতি এবং সুফিবাদের চরম বিকশিত রূপ। একজন মানুষের দেহ, মন, চিন্তাধারা, আত্মা তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্ববিধ শুদ্ধাচার অনুশীলনই হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূল কথা। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূল লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপঃ (১) নিছক পার্থিব স্বার্থপরতাকে পরিহার করে পরিপূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল করা; (২) বিশ্বের ধর্ম-বিরোধ নিরুৎসাহিত করে সর্বজনীন কল্যাণে ধর্মীয় সহাবস্থানের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা; (৩) সত্য ও ন্যায় পথে জীবন যাপনে মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা; (৪) মানুষের মানবিক গুণের বিকাশ সাধন করা; (৫) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা; (৬) স্রষ্টাকে পরম ভালবাসার আরাধ্য জ্ঞান করা; (৭) সকল প্রকার নৈতিক অবক্ষয় রোধপূর্বক ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বিকাশে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বাবাজান কেবলা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.), মুর্শিদ-ই কামিল হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং এই ধারার কামিল অলি ও খলিফাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, মানবতাকামী ও অসাম্প্রদায়িক মাইজভাণ্ডারী দর্শন হচ্ছে তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ এবং এটাই হচ্ছে তাসাওউফের বিশেষত্ব। গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সকল ভণ্ড পীরগিরি ও তথাকথিত সুফিবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ তথা মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পবিত্র কুরআন মজিদ ও সুন্নাহ্‌সম্মত সুফি জীবন ব্যবস্থা কিভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে, তা হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর পৌত্র ও উত্তরাধিকারী মুর্শিদ-ই কামিল হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সুফিবাদের প্রকৃত স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে

গেছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর সুফিকুল শিরোমনি। এ মহান সাধক কর্তৃক নির্দেশিত উসুলে সাবআ বা সপ্ত পদ্ধতি একান্ত যুগোপযোগী ও মানবের বিজ্ঞানসম্মত মুক্তি সনদ। এতটুকু গোঁড়ামীর সেখানে স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে আছে, "হে বিশ্বাসীগণ! যাহা তোমরা কর না তাহা বল কেন? যাহা কর না তাহা বলা খোদার নিকট নিশ্চয় পাপ" (সূরা সাফ্‌ফাত আয়াত ২-৩)। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সুফি তথা রাসূল করিম (দ.) ও তাঁর আহলে বাইত (রা.) এর জীবনাদর্শকে বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা 'সপ্ত পদ্ধতি' সম্বলিত মডেলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। 'সপ্ত পদ্ধতি'র মূল কথা হচ্ছে ত্রিবিধ প্রবৃত্তি বা রিপুর বিনাশ এবং চার প্রকার মৃত্যু বা সমর্পণ। এ সপ্ত পদ্ধতির প্রধান কথা হচ্ছে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, অনর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা পরিহার করা, খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া এবং খোদার প্রতি রুজু থাকা, উপবাসের মাধ্যমে আত্মসংযম শিক্ষা করা, আত্মসমালোচনাপূর্বক নিজের দোষত্রুটির সংশোধন করা, কামভাব ও লালসা থেকে মুক্ত হওয়া এবং নির্বিলাস জীবনে অভ্যস্ত হয়ে অন্তরে খোদার ভালবাসা জাগ্রত করা। সুতরাং, 'সপ্ত পদ্ধতি' হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা এবং এটাই হচ্ছে সুফিবাদের আসল নির্যাস। সপ্ত পদ্ধতি বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে সুফিবাদী জীবন ব্যবস্থা সহজে করায়ত্ত করা যাবে। মানবের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে, রসূল (দ.) ও মহান আল্লাহ্‌তালার রেজামন্দি হাসিল হবে। ফলশ্রুতিতে যাবতীয় সমস্যায় জর্জরিত আমাদের মত উন্নয়নকামী বিশ্ব এবং অপ-সংস্কৃতি আক্রান্ত দেশ (পাশ্চাত্য দেশ) সমূহেও সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচিত হবে এবং সমন্বিতভাবে সারা বিশ্বে মহা প্রশান্তির উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে স্বর্গীয় ফল্গুধারা অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হতে থাকবে। হাফেজ সিরাজী (র.) বলেন, "তোমার চোখের পলক যখন বিশ্ব বিজয়ী অসি বের করল, তখন দিল ঘায়েল জিন্দা মানুষগুলো একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করল" (দিওয়ানে হাফিজ সিরাজী)। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) নির্দেশিত প্রবর্ণিত সপ্ত পদ্ধতি হচ্ছে বেলায়তের রহস্য এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসিয়তের এক উজ্জ্বল নজির। আজ সুফিবাদ সম্পর্কে মিথ্যে প্রচারণার এ যুগে, হতাশা ও গঞ্জনার যুগে; হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, লুটতরাজ, চুরি-ডাকাতি, হানাহানি-মারামারি ও তারকা যুদ্ধের এ বিশ্বে সুফিবাদের প্রকৃত মর্মকথা তথা সপ্ত পদ্ধতির মর্মবাণী ও উপকারিতা হতাশাগ্রস্ত ও মুক্তিসন্ধানী জনগণের কাছে তুলে ধরার মানসে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার যথার্থ বিশ্লেষণ ও প্রচার একান্ত অপরিহার্য। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সত্যিকার আলোকে আলোকিত হতে হতাশাগ্রস্ত

জনগণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হবে। হযরত পীরানে পীর (র.) বলেন, "খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাঁরা যার প্রতি নজর বা দৃষ্টি নিবন্ধ করেন, তাঁর রূহানী বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হতে থাকবে। সে ব্যক্তি ইহুদী, নাসারা বা মজুছীও যদি হয় তবুও। যদি মুসলমান হয়, তবে ঈমান শক্তিশালী হয়" (ফতহুর রব্বানী : পৃঃ ৫০৫-৫০৬)। আমরা যদি প্রকৃত সুফিবাদের তাৎপর্য বুঝতে না পারি এবং প্রকৃত সুফির সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, তবে অজ্ঞানতার চির পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকার এবং স্রষ্টার পবিত্র দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। কেননা একমাত্র প্রকৃত ইসলামী চেতনা, সত্যিকার সুফিবাদ এবং এ দু'য়ের সমন্বিতরূপ 'সপ্তপদ্ধতি' সম্বলিত মাইজভাণ্ডারী দর্শনই দিতে পারে সর্বজনীন মুক্তির আস্বাদ এবং মহান স্রষ্টার নৈকট্য (বেলায়তে মোত্লাকা)। তাই পীরানে পীরের ভাষায় বলি, "তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আগ্রহান্বিত হও, এগিয়ে আস, আমি তোমার জন্য দোয়া করি। আর যখন আগ্রহবিমুখ হও ও পশ্চাতে তাকাও, আমি তখনও পূর্ববৎ থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি, যেহেতু পেছন দিকে কিছু দেয়া-নেয়ার নিয়ম নেই"। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সংজ্ঞা, প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের উপায় বা প্রক্রিয়া সমূহ একজন প্রকৃত মাইজভাণ্ডারীর বৈশিষ্ট্য, মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহ ও উহাদের বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সমাজের অবক্ষয়রোধে মাইজভাণ্ডারী দর্শন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। মাইজভাণ্ডারী দর্শন ধ্বংসের দিকে আগুয়ান জনসমাজের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূলকথা হল অনিত্য, অনাসক্তি, বিরোধ পরিহারপূর্বক পীরে কামেলের জ্ঞান-জ্যোতির অন্বেষণ করা, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারে বিশুদ্ধ নৈতিকতার প্রাধান্য স্বীকার করা এবং খোদার একত্ব ও আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হওয়া, সেহেতু এটা সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে, সমাজ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে, সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে, ইহকাল-পরকালের মঙ্গল সাধনে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সম্পূর্ণ সক্ষম। কলহ-বিবাদ জর্জরিত বর্তমান সমাজে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ভূমিকা আজ তাই অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। মাইজভাণ্ডারী দর্শন যথাযথভাবে অনুশীলন করলে সমাজ পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর অশুভ কালো হাত থেকে রেহাই পাবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল প্রকার বৈষম্য দূর হবে এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আসুন, আজ আমরা সবাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বাস্তব মডেল হযরত গাউসুল

আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), মুর্শিদ-ই বরহক হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর জীবন ও কর্মধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং প্রতিনিয়ত মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে একটি আদর্শ, সুখী, সুন্দর, কল্যাণমুখী ও স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণ করি। প্রশান্তির উষ্ণতায় জগৎ ও জীবন তথা ইহকাল ও পরকালকে সমৃদ্ধ করি। খোদা আমাদের এই মহতি প্রচেষ্টায় সহায় হোন। আমিন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের পরিপূর্ণতায় তাসাওউফের অবদান অপরিসীম। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করা এবং এ পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করে শান্তির আবাসে পরিণত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিয়মিত তাসাওউফের চর্চা ও অনুশীলন করা। তাছাড়া যেহেতু ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক জ্ঞান ও তাসাওউফের (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) সমন্বিত রূপ, সুতরাং ইসলামের পরিপূর্ণ বিকাশে তাসাওউফের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা বাহুল্য, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিকাশে সুফিসাধকগণ তাসাওউফের বলে বলীয়ান হয়ে কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন। তাই মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত বর্তমান মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে হলে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টাকে পেতে হলে তাসাওউফের খণি অলিআল্লাহ্গণের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ প্রগতিশীল মননের প্রতীক মাইজভাণ্ডারী দর্শনের চর্চা করা একান্তই জরুরী।

গাউসুল আযম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী:
● "ফেরেশ্তা কালেব বনিয়া যাও"। ● "কবুতরের মত বাছিয়া খাও। হারাম খাইওনা, নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।" ● "তাহাজ্জুদের নামায পড়, সালাতুত্ তসবীহ্র নামায পড়"। ● "আমি মক্কা শরীফে গিয়া দেখিলাম রসূল করিম (দ.)-এর 'সদর' (বক্ষস্থল) মোবারক এক অনন্ত দরিয়া। আমি ও আমার ভাই পীরানে পীর সাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।" ● "রসূলুল্লাহ্ (দ.)-তাঁর দুইটি টুপির মধ্যে একটি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের মাথায় দিয়াছেন।" ● আমি মজ্জুবে মাহজ নই, মজ্জুবে সালেক হই, বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায পড়ি।"
● "দুনিয়া মুসাফেরীর জায়গা, এইখানে আড়ম্বরের দরকার কী?"

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এর বাণী: • যারা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে, হাশরের দিন তারা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর আসহাব বা সাথী হিসেবে গণ্য হবে।" • "মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার যথার্থ প্রচার, প্রসারে বিশ্ব দৃষ্টি মাইজভাণ্ডার শরীফের দিকে ঘুরে যাবে।"

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী: • "রহমতুল্লিল আ'লামিন রসূলের (সা) রহমতের সীমাজুড়ে আমার বেলায়তি কর্ম-ক্ষমতা।"
• "হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে।"
• বিশ্ব মুসলিম সমস্যা সমাধানে বিশ্ব মুসলিম লীগ (স্বতন্ত্র বিশ্বসংঘ) গড়তে হবে।"
• "A man can not live in society wi.hout Co-operation".
• "Maizbhandar Sharif is an ocean, Do not think i. otherwise."

প্রকৃত পীরের পরিচয়

১। ইমাম শারানী (রা.) তাঁর 'আখলাকে মতবুলিয়া' কিতাবে বলেছেন, 'কামিল পীরের পরিচয় এই যে, তিনি হাজার বৎসরের দূরবর্তী স্থান হতে মুরীদের আহ্বান শুনতে পান।"

২। সাইয়েদী ইব্রাহমী দাসুকী (র.) বলেছেন, "প্রকৃত মুরীদ যদি হাজার বৎসরের দূরত্ব হতেও পীরকে আহ্বান করে, তবে সেই পীর জীবিত থাকুন বা না থাকুন, তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন। দুনিয়ার কোন বিষয় তাকে চিন্তান্বিত করলে যদি তার কালবের মাধ্যমে পীরের প্রতি মুতাওয়াজ্জোহ্ হয়, তবে সে পীরের সাহায্য এবং বাণী প্রাপ্ত হবে। চোখ বন্ধ করলে তার কালবে পীরকে ভালভাবে দেখতে পাবে (আনওয়ারে কুদসীয়া ১৮৯ পৃঃ)।

৩। সাইয়েদী আলী ইবনে ওফা (র.) বলেছেন, "তুমি যদি হাকীকী পীর প্রাপ্ত হও, তবে জেনো যে তুমি হাকীকত লাভ করেছ, হাকীকত লাভ করলে জেনো যে, তদসহ আল্লাহ্ লাভ করেছ, আল্লাহ্ লাভ করলে জেনো যে, প্রত্যেক বস্তু লাভ করেছ। হাকীকী পীরের মাধ্যমে এ সমস্তই সম্ভবপর" (ঐ-১৯০ পৃঃ)। শায়খ কমশ খানবী (র.) তাঁর "জামেউল উসুল" কিতাবের ১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠায় হাকীকী পীরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "হাকীকী পীর তিনি, যিনি সাহেবে কামাল, সাহেবে সুলুক, সাহেবে জজ্‌বা, যিনি জিকির ও খেরকা ব্যতীতই তাঁর হালতের সাহায্যে মুরীদকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম।" যে সমস্ত পীর খেরকা দ্বারা অথবা জিকির দ্বারা মুরীদকে আপন লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেন, তাঁদেরকে "শায়খুল খেরকা" অথবা "শায়খুজ জিকির" বলা হয়। তাঁরা হলেন "মাজাজী পীর"।

৪। শায়খ আবুল হাসান শাজলী (র.) বলেছেন, "যদি আমার জিহ্বার উপর শরীয়তের লাগাম না থাকত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন এ বিশ্বে যা সংঘটিত হবে, আনায়াসে তা সমস্তই বলে দিতাম" (জামেউল উসুল-৮৩ পৃঃ)। অনুরূপ বলেছেন, হযরত বড়পীর (র.) তাঁর "ফাতহুর রাব্বানী" কিতাবে এবং শায়খে আকবর (র.) তাঁর "ফুতুহাত" কিতাবে। যাঁরা প্রকৃত কামিল, সমগ্র বিশ্ব তাঁদের নিকট সরিষার দানার সমতুল্য।

যেমন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমিরী (র.) বলেছেন– "আরেফগণের জন্য এমন এক স্তর রয়েছে যেখানে পৌঁছলে তাঁর সমগ্র বিশ্বস্থিত যাবতীয় বস্তুকে নিজেদের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে দেখতে পান। তিনিই আরেফ যিনি ইচ্ছামাত্র যা চান, তা সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পান।"

৫। হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) বলেছেন, "কামিল তিনি, যাকে বিশ্বের কোন বস্তু আল্লাহ্‌তা'লার মোশাহেদা হতে বিরত রাখতে পারে না" (লাতায়েফুল মানান- ১ম খন্ড-১২৭ পৃঃ)।

৬। শায়খ আহমদ কমশখানবী (র.) বলেছেন, "যাঁর মধ্যে পাঁচটি গুণ বিদ্যমান, তিনিই পীর হওয়ার উপযুক্ত, যথাঃ (১) প্রত্যক্ষ অনুভব, (২) সঠিক জ্ঞান, (৩) পূর্ণ একাগ্রতা (৪) সঠিক হালত, (৫) দূরদর্শী কাশ্‌ফ আর পাঁচটি দোষ যার মধ্যে বিদ্যমান পীর হওয়ার উপযুক্ত সে নয়, যথাঃ (১) শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞানের অভাব, (২) মুসলমানগণের নিন্দা করা, (৩) অপ্রয়োজনীয় কার্যে ব্যাপৃত থাকা, (৪) প্রত্যেক কার্যে নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, (৫) অসদ দোষ বিশিষ্ট হওয়া" (জামেউল উসুল- ১১ পৃঃ)।

৭। হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) এও বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ফিকাহ্‌, হাদিস ও তাসাওউফের জ্ঞানে উচ্চতর স্থান অধিকার করতে না পারে, সে আমাদের বিবেচনায় কামিল নয়।"

৮। হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) আরো বলেছেন, "যিনি পীর হবেন, তাঁকে শরীয়তের জ্ঞানের সমুদ্র হওয়া উচিত। কারণ, মুরীদকে আল্লাহ্‌র পথে চালনা করতে হলে তার প্রতিটি কার্যে শরীয়তের মানদণ্ড আবশ্যক" (আনওয়ারে কুদসীয়া– ৪২ পৃঃ)।

৯। শায়খ আবদুল ওহ্‌হাব শারানী (র.)'র পীর সাইয়েদী আলী খাওয়াস (র.) বলেছেন, "কামিল হওয়ার নিদর্শন এই যে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি আল্লাহ্‌র (কর্তব্যে ত্রুটিজনিত) লজ্জায় বিগলিত হয়ে পড়বেন" (লাওয়াকেহুল আনওয়ারেল কুদসিয়া ১৭৫ পৃঃ)।

১০। তিনি এও বলেছেন, "কামিল হওয়ার নিদর্শন এই যে, তিনি হাদিস, ইজমা ও কিয়াস ইত্যাদি শরীয়তের যাবতীয় দলিল দিব্যদর্শন দ্বারা অনুভব করতে সমর্থ হবেন (লাওয়াকেহুল আনওয়ারেল কুদসিয়া ৬৩০ পৃঃ)।

১১। তিনি এমনও বলেছেন, "কামিল হওয়ার নিদর্শন এই যে, তিনি মাজহাবের ঈমামগণের যাবতীয় উক্তির ভিত্তিকে কাশফের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, কোন্‌ ঈমামের কোন্‌ উক্তি কুরআন হাদিসের অনুকূল এবং কোনটি প্রতিকূল, তাও তিনি কাশফের সাহায্যে বুঝতে সমর্থ হবেন (ঐ ৬৩৩ পৃঃ)।

১২। তিনি আবার বলেছেন, "কামিল তিনি, যিনি ফকীহ্‌, মোহাদ্দেস ও সুফি" (ঐ ৪৩৬ পৃঃ)।

১৩। সাইয়েদী ইব্রাহিম মাতবুলী (র.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের প্রতিটি অক্ষরের গুপ্ততত্ব না বুঝে এবং তা হতে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম বাহির করতে না পারে, সে আমাদের নিকট কামিল বলে বিবেচিত হয় না" (ঐ- ৬৪৪ পৃঃ)।

১৪। তিনি এও বলেছেন, "কেউ কামিল হতে পারে না, যে পর্যন্ত সে কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ এবং ফিকাহ্ জ্ঞানে উচ্চস্থান অধিকার করে এবং কোন কামিল পীরের শুভ দৃষ্টিতে থেকে নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা ত্বরিকতের গভীর জ্ঞান অর্জন করে, শুধু কিতাবাদি পাঠ বা শ্রবণাদি দ্বারা নয়" (ঐ- ৬৩৬ পৃঃ)।

১৫। শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, "সে ব্যক্তি কামিল, যার কালব্ কখনো নিদ্রা যায় না, দিনরাত সর্বক্ষণ জাগরিত থাকে। এটিই হলো কামিলদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীরাজ" (ফুতুহাতে মাক্কিয়া-বাব ৯৮)।

১৬। হযরত জুন্নুন মিসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কামিল হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের যাবতীয় হাওল্ এবং কুওয়াতের দাবী হতে বহির্গত হয় এবং বিশ্বের কোন বস্তুর অধিকারের দাবী পরিত্যাগ করে" (রাওজুর রাইয়াহীন- ৪০৯ পৃঃ)।

১৭। সাইয়েদী আল খাওয়াস (র.) বলেছেন, "কামিল পীর তিনি, যিনি কুরআন-হাদিসের সম্যক জ্ঞান রাখেন, কথায় ও ক্রিয়ায় কুরআন-হাদিসের সীমা লঙ্ঘন করেন না, আল্লাহ্তা'লার সৃজনের প্রতি যথেষ্ট দয়ালু, কোন গোনাহ্গারকে ঘৃণা করেন না, বরং তাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় থাকেন এবং বিনম্র বচনে তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান। নেককার, বদকার, ফাসেক কাজের সবার প্রতিই তাঁর দান থাকে অকাতর। সমস্ত সৃজনকে তিনি নিজের পরিবারভুক্ত বলে বিবেচনা করেন" (লাওয়াকেহুল আনওয়ার- ১৭৩ পৃঃ)।

১৮। সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরিকার পীর শায়খ শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) বলেছেনঃ কামিল পীর তিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত নায়েব। তাঁর পরিচয় এই: (ক) তিনি ত্বরিকতের পীরদের এমন সিলসিলাভুক্ত হবেন, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংলগ্ন ও প্রসারিত; (খ) তিনি কুরআন হাদিসের পূর্ণ আলেম হবেন। কারণ, জাহেল কখনও হেদায়তের কার্যে নিযুক্ত হতে পারে না, (গ) তিনি দুনিয়া এবং ইজ্জতের মহব্বত হতে সম্পূর্ণ পবিত্র, (ঘ) অল্প-ভোজন, অল্প-নিদ্রা এবং নীরবতার রিয়াজতের সাহায্যে নফ্স তাঁর সম্পূর্ণ বশীভূত হবে, (ঙ) নামায, রোজা এবং সাদকার আধিক্যের মাধ্যমে যার নফ্স পরিমার্জিত,

(চ) "সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, একীন, সাখাওয়াত (দানশীলতা), কানায়াত্ (অল্পে সন্তুষ্ট থাকা), হেলম (সহনশীলতা), তাওয়াজু (নম্রতা), হায়া (লজ্জা), ওফা (প্রতিজ্ঞা পালন, আমানত আদায়করণ), ওকার (গাম্ভীর্য) এবং সুকুন (নীরবতা) ইত্যাদি আখ্লাক দ্বারা বিভূষিত" (খাজিনাতুল আসরার-১৯৪ পৃঃ)।

১৯। হযরত শেখ আহমদ সারহিন্দি (র.) তাঁর মাকতুবাতে বলেছেনঃ "ফকীরের নিকট কামালিয়তের অর্থ এই যে, উরুজের সময়ে সালেকের নজরে কাসরত সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যাবে। এমন কি আসমা ও সিফাতের কোন লেহাজ থাকবে না। শুধু "আহাদিয়াতে সঙ্গে রাঙ্গা" ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর থাকবে না। অতঃপর, সালেকের সঙ্গে যে মোয়ামেলা করার তা করা হয়। নুজুলের সময় সালেকের নজর সম্পূর্ণরূপে কাসরতের উপর পড়ে; তখন সাধারণ মোমিনদের ন্যায় সালেকের নজরে মাহবুব ব্যতীত অন্য কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ অবস্থায় আল্লাহ্তা'লার ইবাদত করা এবং মাখলুককে আল্লাহ্তা'লার প্রতি দাওয়াত বা আহ্বান করা ব্যতীত আর কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এ অবস্থায় আল্লাহ্তা'লার ইবাদত করা এবং মাখলুককে আল্লাহ্তা'লার প্রতি দাওয়াত বা আহ্বান করা ব্যতীত আর কোন কাজ থাকে না। দাওয়াতের কার্য শেষে সালেক এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্তা'লার মহান দরবারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের খেয়াল গায়েব হতে শাহাদাতের দিকে নিয়ে যান। ....এমতাবস্থায় কোন কোন 'নাকেস' বা নালায়েক ব্যক্তি এরূপ বুজুর্গের এমন 'রুজু' ক্রিয়াকে যেন ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে না করে এবং আল্লাহ্তা'লার প্রতি তার বাতেনী তাওয়াজ্জোহকে মাখলুকাতের প্রতি তাওয়াজ্জোহ হতে যেন ভাল মনে না করে। কেননা, সাহেবে রুজু নিজের ইচ্ছানুযায়ী উন্নতির চরম শিখর হতে নিম্নে অবতরন করেন। কাজেই 'সাহেবে রুজু' নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে আল্লাহ্তা'লার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং সাহেবে তাওয়াজ্জোহ্ মিলন ও শুহুদের স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত এবং কুরব ও মাইয়াতের আনন্দে অভিভূত থাকেন।"

তবে অবশ্য এমন পীরও বহু আছেন যারা কোন কামিল মোকাম্মেল পীরের সোহবত হতে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করে খেলাফত লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁদের হালত তাঁদের নিজেদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। তাঁদের মুরীদগণের আজীব কাশ্ফ ও হালত দৃষ্ট হয়। হযরত শেখ আহমদ সারহিন্দি সানী (র.)'র এক খলিফা জনাব মাওলানা আহমদ জাহ্বী এই ধরনের সালেক ছিলেন (মকতুবাত দ্বিতীয় দফতর- ১৬নং পত্র দ্রষ্টব্য)। আহমদ জাহবী সাহেব তেমন সাহেবে হাল ছিলেন না, কিন্তু তাঁর দুইজন মুরীদের আশ্চর্য রকমের হালত ও কাশফিয়াত দৃষ্ট হলে তিনি তা তাঁর পীর সাহেব

কেবলাকে জানালেন। উত্তরে তিনি জানালেন যে, ঐ মুরীদদ্বয়ের হালত তাঁরই (আহমদ জাহ্বী সাহেবের) হালতের প্রতিবিম্ব। উক্ত পত্রে তিনি আরও বুঝিয়ে বলেছেন যে, পীর যদি সরাসরি নিজের হালত নিজে না বুঝতে পারে, তবে মুরীদের কালবের আয়নায় তা বুঝে নিবে। হালত লাভ করা প্রয়োজনীয়। হালতের ইলম নিজের নিকটে না থাকলেও কামালিয়াতের কোনও ক্ষতি হবে না; বরং কামিল পীর হালকে অতিক্রম করে সাহেবে মাকাম হয়ে পূর্ণরূপে নুজুল করে থাকেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কামিল পীর 'সাহেবে-হাল' মুরীদ হতে যদি নিজের হাল জেনে নেন, তবে তাতে পীরের কামালিয়াতের কোন ক্ষতি হবে না। পীর আরেফ বিল্লাহ্, তিনি যা কিছু করেন, আল্লাহ্তা'লার রেজামন্দী হাসিল করার জন্যই করেন। জনাব রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহেবে ওহী হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়-ই কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। পরামর্শদাতার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করার অর্থ পরামর্শদাতাকে পরোক্ষভাবে এতায়াত করা। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে এতায়াত করে থাকলে পীর যদি কোন কোন ক্ষেত্রে মুরীদের কালব বা মুরীদের হালত হতে উপকৃত হন, তবে ক্ষতির কি কারণ থাকতে পারে? বরং সাহেবে হাল মুরীদের "উজুব" হতে সাবধান থাকা উচিত। কারণ, সালেকের পক্ষে কোনও অবস্থায় নিজের হালতে উৎফুল্ল হয়ে নির্ভীক হওয়া উচিত নয়।

২০। শায়খে আকবর (র.) তাঁর "ফুতুহাতে মাক্কীয়া" কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "তিনিই পীর হওয়ার উপযুক্ত যিনি কুরআন, হাদিস ভালভাবে জানেন, মুখেও যেমন বলেন, অন্তরেও তেমনি উচ্চতম স্থান দিয়ে থাকেন, আল্লাহ্তা'লার নির্দেশিত সীমারেখার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন, তাঁর নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, শরীয়তের রীতিনীতি পালন করে থাকেন, পরহেজগারীতে কোন প্রকার তাবিল করেন না, শরীয়তের বিধানসমূহ সতর্কতার সাথে অনুসরণ করেন, নিজকে শরীয়তের সীমালঙ্ঘনকারীগণ হতে দূরে রাখেন, উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি সদয় থাকেন, আল্লাহ্তা'লার পছন্দানুযায়ী তাঁরা পছন্দ করেন, অপছন্দানুযায়ী তাঁরাও অপছন্দ করেন, আল্লাহ্তা'লার নীতি অনুসরণে কোন প্রকার মন্তব্যের পরওয়া করেন না, সৎকার্যের আদেশ এবং সর্ববাদীসম্মত অসৎ কার্যের জন্য নিষেধ করে থাকেন, নেকীর কার্যে দ্রুতগামী থাকেন, মানুষের নিকট কোন কিছুর আশা-ভরসা করেন না, বয়োজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা এবং কনিষ্ঠের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, আল্লাহ্তা'লার এবং মানুষের পথ হতে যাবতীয় কন্টক দূর করে থাকেন, মানুষকে আল্লাহ্তা'লার প্রতি আহ্বান করার সময় প্রথমে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ, তৎপর তদপেক্ষা লঘুতর

ফরজ এবং এইরূপে ক্রমানুসারে লঘুতর ফরজের দিকে আহ্বান করেন, মানুষের দাবী-দাওয়া, হক ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করেন, সমস্ত প্রকার মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সমস্ত মানুষকে আপন পরিবারভুক্ত মনে করেন এবং সেই হিসাবে সমবয়সীদের ভ্রাতার ন্যায়, বয়োজ্যেষ্ঠকে পিতার ন্যায়, কনিষ্ঠগণকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করে থাকেন, সকলের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, নিজেদের সমস্ত ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ্তা'লার সাহায্যে সম্পাদিত হতে দেখতে পান, গোনাহ্ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করেন এবং তজ্জন্য আল্লাহ্তা'লার কাছে সবিশেষ লজ্জিত থাকেন, গোনাহের জন্য নিজেদেরকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন, তকদীরের হাওলা দিয়ে গোনাহ্সমূহকে হালকা মনে করেন না। কারণ, এটা নিতান্ত বেয়াদবী, তাঁরা থাকেন নিতান্ত সহজ সরল এবং প্রেমপূর্ণ, সৃজনের প্রতি যথেষ্ট দয়ালু, প্রায়ক. চিন্তামগ্ন থাকা তাঁদের স্বভাব বিশেষ। এ প্রকার ব্যক্তিবর্গই পীর হওয়ার উপযুক্ত এবং অনুসরণীয়। এদের তাজীম করা ওয়াজিব। এরা সেই সমস্ত মানুষ যাদেরকে দর্শন করলেই আল্লাহ্র জিকির জেগে উঠে। আর এক প্রকার বুজুর্গ সম্প্রদায় আছেন, যাঁরা 'সাহেবে হালত'। তাঁরা নিজেদের কালবী হালতকে শরীয়তী আইনের গন্ডির মধ্যে রাখতে সক্ষম নন। তাঁদের কাল্বী হালত প্রশংসনীয় এবং স্বীকার্য বটে, কিন্তু পীর হিসেবে তাঁরা আদৌ গ্রহণীয় নন, যদি কারামতও প্রকাশ পায়, তবু অনুসরণীয় নন। কারণ, শরীয়ত-গন্ডি বহির্ভূত ব্যক্তি অন্যের গ্রাহ্য নয়। এক কথায়, শরীয়তের রঙ্গে যাঁরা রঞ্জিত নন, তাঁরা আল্লাহ্তা'লার কাছে যত মর্যাদা সম্পন্নই হোন না কেন, অপরের জন্য পীর হিসেবে গ্রহণীয় নন।

২১। শায়খে আকবর তাঁর "রদ্দুল মখবুত্ ইলাল কাওলেল মজবুত" কিতাবে পীর হওয়ার যে সমস্ত শর্তাবলী বলেছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উদ্বৃত হলঃ

(১) তিনি যেন অনুমতি ব্যতীত মুরীদকে কোথাও যেতে না দেন; (২) মুরীদের অপরাধ হলে তা যেন ক্ষমা না করেন, কারণ এক্ষেত্রে ক্ষমা করার অর্থ মুরীদকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়া। এই জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার কাছে যার অপরাধ সাব্যস্ত হবে, তার উপর 'হদ' জারী করবই।" পীর মুরীদের জন্য শাসক সমতুল্য। শাসিতের অপরাধ ক্ষমা করা শাসকের জন্য আদৌ বিধেয় নয়; (৩) মুরীদের কাছ হতে তিনি যেন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, কোন বিষয়ই তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখবে না; কারণ পীর চিকিৎসকের সমতুল্য; চিকিৎসকের কাছে রোগের বিষয় গোপন করলে উপযুক্ত চিকিৎসা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে পীরও যদি এ শ্রেণীর রোগের সমস্ত ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্যক অবগত না হয়ে শুধু কিতাবী জ্ঞান দিয়ে চিকিৎসা করতে চান, তবে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

হয়ে উঠে। এজন্য পীরকে সম্পূর্ণ সাহেবে কাশ্‌ফ হতে হবে; (৪) বিনা পরীক্ষায় কাউকে মুরীদ করা আদৌ উচিত নয়। অতএব, কাউকে মুরীদ করার পূর্বে পীর যেন ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন; (৫) যেহেতু ত্বরিকতের পথ ভোগবিলাসের বা আরাম-আয়েশের নয়, অতএব পীর যেন মুরীদকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে দেন। শুধু ফরজ ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদায় করা সাধারণ ঈমানদারের কাজ। ত্বরিকতপন্থীর কর্তব্য এ অপেক্ষা অনেক বেশী। সমস্ত দিন আল্লাহ্‌র কাজে ব্যাপৃত থাকাই সালেকের একমাত্র কর্তব্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ রকমের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তার কর্তব্যও হবে বিশেষ রকমের। সেই কারণে মুরীদের জন্য কোন রোখ্‌সত নাই, কোন আরাম নাই, কোন বিশ্রাম নাই, কোন অবসর নাই; (৬) তিনি যেন উপযুক্ত পীরের অনুমতি ব্যতীত অথবা আল্লাহ্‌র তরফ হতে ইলহামের মারফতে অনুমতি লাভ করা ব্যতীত পীরের গদীতে না বসেন; (৭) তাঁর কথার উপর কোন মুরীদ যেন কোন প্রকার মন্তব্য না করে বা তার প্রতিবাদ না করে। যে এমন আচরণ করে সে মুরীদ হিসাবে থাকার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কারণ, শুধু আকলের দ্বারা আল্লাহ্‌র মা'রিফত লাভ হয় না। একমাত্র কাশ্‌ফ ব্যতীত মা'রিফাত লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। পীর যে স্থলে কাশ্‌ফ প্রসূত জ্ঞান দ্বারা কথা বলেন, সেখানে মুরীদের পূর্ণ তসদীক ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। কোন মুরীদ এতে অপারগ হলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। নচেৎ অন্যান্য মুরীদগণও তা দ্বারা প্রভাবান্বিত ও নষ্ট হবে। এমন মুরীদ কখনও মঙ্গল লাভ করতে পারে না; (৮) কোন মুরীদকে তাঁর প্রতি অনুরাগবিহীন দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে মুরীদিয়াত হতে খারিজ করা উচিত, কারণ এরূপ মুরীদ সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। এরূপ মুরীদের সাথে অন্যান্য মুরীদগণকে আদৌ মিশতে দেয়া উচিত নয়। কারণ, ত্বরিকতপন্থী নয় এমন কারো সাথে মুরীদের সংমিশ্রণ বিষতুল্য মারাত্মক; (৯) সাধারণের মজলিশে বসে তিনি যেন শরীয়তের খেলাফ কোন কার্য না করেন; (১০) নিজের খাস ইবাদতের জন্য তিনি যেন সময় রাখেন; (১১) মুরীদকে যেন অন্যান্য মানুষের সাথে সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ নিষেধ করেন; (১২) তিনি যেন নিজের হালত বা কারামত কোন মুরীদের কাছে প্রকাশ না করেন; (১৩) দিনরাতের মধ্যে একাধিক বার যেন তিনি মুরীদগণের সাথে মজলিস না করেন।

২২। এ সম্বন্ধে হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ (র.) যা বলেছেন, তা উদ্বৃত করা হল:
"এ যুগে ইল্লা মা শায়াল্লাহু, এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি সবদিক দিয়ে কামিল। কেউ এক দিক দিয়ে কামিল হলে অন্য দিক দিয়ে কামিল নন। অতএব, তাঁর যে দিক কামিল সেটি গ্রহণ করা উচিত, যে বিষয়ে তিনি কামিল নন, তা হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা উচিত।" যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যা পরিষ্কার তা গ্রহণ কর, যা অপরিষ্কার তা বর্জন কর। সুফিয়া-ই কিরামদের নিসবত এক মহা নিয়ামত, কিন্তু এদের অনুষ্ঠানসমূহের কোন মূল্য নেই। আমার কথা অনেকের কাছে নিতান্ত কঠিন বোধ হবে, কিন্তু আমি কি করি? যা বলতে আদিষ্ট হয়েছি, তা আমাকে বলতেই হবে, জায়েদ ও ওমরের কথায় আমি সত্যকে চাপা দিতে পারি না।”

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্'র এ বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাক্কেক বুজুর্গ, তাঁর মূল্যবান বাণী আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। ১১৭৯ হিজরীতে তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তবে তাঁর পর ২০০ বৎসরেরও অধিক গত হয়ে বর্তমান জমানার অবস্থায় যে কত শোচনীয় হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব, এ জামানায় শুধু রসম রেওয়াজ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে শরীয়তের কষ্টিপাথরকে মজবুতভাবে ধারণ করে আমাদেরকে ত্বরিকতের পথে অগ্রসর হতে হবে। পীরের কার্যাদির মধ্যে যা শরীয়ত সম্মত নয়, তা অনুকরণ করা আদৌ সংগত হবে না।

সর্বজনস্বীকৃত বুজুর্গগণের এমন আরো বহু উক্তি রয়েছে যাতে প্রকৃত কামিল পীরের পূর্ণ চিত্র পরিস্ফুট। এ সমস্ত হতে প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত কামিল পীর হওয়া সহজসাধ্য নয়। শায়খ আহম্মদ কামাশখানবী (র.) প্রণীত “জামেউল উসুল” কেতাব হতে পরিষ্কার বোঝা যায়, যে পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি শরীয়তের এবং আল্লাহ্তায়ালার আসমা এবং সিফাতের, তাজাল্লীয়াতের এবং তাওহীদে আফয়ালী, তাওহীদে মুলকী এবং তাওহীদে উজুদির প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কামিল পীর হতে পারেন না। এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই প্রকৃত কামিল এবং পীর হবার উপযুক্ত। এরূপ কামিল ব্যক্তিকে অন্ধের মত অনুসরণ করা যায়– যেহেতু তিনি শরীয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত ও মা'রিফাতের উচ্চস্তরে বিচরণকারী। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগে এমন ব্যক্তি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, সেজন্য শায়খ আবদুল ওহ্হাব শারানী (র.) বলেছেন, “যদি উক্তরূপ কামিল ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তবে ত্বরিকত সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিকেই পীর স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত (আনওয়ারে কুদসিয়া ফি মারিফাতে কাওয়ায়েদে সুফিয়া- ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

আরেফে কবীর শায়খ শারানী (র.) তৎপ্রণীত “এওয়াকীত” কিতাবের ২য় খন্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “যে পর্যন্ত না কোন অলিউল্লাহ্ বিনা মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন, সে পর্যন্ত তিনি উম্মতে মোহাম্মদীর ইরশাদের কাজে নিযুক্ত হতে পারেন না এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকার জন্য উপযুক্ত হতে পারেন না। হযরত আলী খাওয়াস (র.)'র বাণীও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থক। তিনি বলেছেন, “ত্বরিকতের পথে কেউ কামিল পীর হতে

পারেন না, যে পর্যন্ত না তিনি ঐ উৎস হতে জ্ঞান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, যে উৎস থেকে আয়িম্মায়-ই মুজতাহিদীনগণ জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন (এওয়াকীত কিতাবের ২য় খন্ডের ৯২ পৃঃ দেখুন)। এ কথাকে হযরত শায়খে আকবর (র.) ও তাঁর 'ফুতুহাত' কিতাবের ২৬৮ বাবে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, কাশ্‌ফে ইলাহী ও ইল্‌মে একিনী ব্যতীত যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকতে যায়, সে আল্লাহ্‌র মকর হতে কখনও নিরাপদ নয়; সে যতই সুন্নাতের তাবেদার হোক না কেন (এওয়াকীত- ২য় খন্ড ১০৬ পৃঃ)। কারণ, যিনি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবেন তাঁর কলবে ইলকায়-ই রহমানী থাকা আবশ্যক এবং আয়নুল একীন ও হক্কুল একীন থাকা প্রয়োজনীয় যা কলবের দ্বার না খোলা পর্যন্ত সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের বাণীকে হুবহু উদ্ধৃত করার পর তার সঠিক ব্যাখ্যা করে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। এ বিষয়ে শাহ্ অলিউল্লাহ্ (র.) প্রণীত "কাউলুল জমীল" কিতাবের ৯ম অধ্যায়ের বিবরণও দ্রষ্টব্য। অতএব; আজকাল ধর্ম প্রচারের নামে যে রূপ কেচ্ছাকাহিনীর অপপ্রচার চলছে, কুরআন হাদিসের হুবহু উদ্ধৃতির কোন নাম গন্ধ নেই, তা যে বুজর্গানে দ্বীনের সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ এবং হাদিসের খেলাফ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকাল এইরূপ হাটুরিয়া ওয়াজ-নসিহতের বহরই অত্যধিক। এরূপ ওয়াজে অংশগ্রহণ করেন বহু জাহেরী আলেম, এমন কি তথাকথিত সুফি দরবেশগণও। এরূপ ওয়াজে আমি এমন সব কথা বলতেও শুনেছি যা দ্বীন, ঈমান ও তাওহীদের জন্য বিষতুল্য মারাত্মক। হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ (র.) তাঁর "কওলুল জমীল" কিতাবে যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছেন, সে সব শর্তবিশিষ্ট সুফি আলেম ছাড়া অন্য কারও ওয়াজ শ্রবণ করা দ্বীন, ঈমানের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

পীরের আবশ্যকীয়তা এবং পীরের সাথে মুরীদের সম্পর্ক

“পীর ধরি বেয়াদবী করে যেই জন
ঈমানের নূর সে যে পাবে না কখন।”

ঈমাম শারানী (র.) বলেন, “পীরের সাথে মুরীদের প্রকৃত আদব হচ্ছে তাঁর জন্য গভীর মহব্বত রাখা। যে মুরীদ নিজের পীর-মোরশেদকে অন্যান্য সমস্ত খাহেশাতের উপর মহব্বত না করে, ত্বরিকতের পথে তার জন্য কোন মঙ্গল নাই। যে ব্যক্তি তার নিজের এবং আল্লাহ্তা'লার মধ্যবর্তী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ যাবতীয় ওয়াসীলার প্রতি মহব্বত না রাখে, সে মোনাফিক এবং মোনাফিকের স্থান দোজখের নিম্নতম স্তরে।”

সমস্ত সুফিয়ায়-ই কিরাম এক বাক্যে বলেছেন, “পীরের প্রতি মহব্বতের নিদর্শন হচ্ছে সমস্ত গোনাহ্ হতে তাওবা করা। যে ব্যক্তি গোনাহে বিজড়িত থেকে পীরের মহব্বতের দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি পীরের প্রতি মহব্বত রাখে না, পীরও তাকে মহব্বত করেন না। পীর যাকে মহব্বত করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লাও তাকে মহব্বত করেন না।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্তা'লা বলেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ্তা'লা তাওবাকারী ও পবিত্রদেরকে মহব্বত করেন।” তাঁরা এও বলেছেন, “পীরের প্রতি মহব্বতের নিদর্শন এই যে ত্বরিকত সম্বন্ধে নিজের পীর ব্যতীত অন্য কারো কথা না শোনা।”

শায়খ আফজালুদ্দীন (র.) বলেছেন, “পীরের প্রতি প্রকৃত মহব্বতের নিদর্শন এই যে, পীর যাকে মহব্বত করেন, মুরীদও তাকে মহব্বত করেন এবং পীর যাকে অপছন্দ করেন, মুরীদও তাকে অপছন্দ করবে।” হাদিস শরীফে আছেঃ “কিয়ামত দিবসে একজন বান্দাকে উপস্থিত করা হবে যার নামায, রোজা, হজ্ব, সদকা ইত্যাদি অধিক এবং ফেরেশ্তাগণও তার ইবাদত-বন্দেগীর সাক্ষ্য দান করবেন। আল্লাহ্তা'লা বলবেন, “দেখ তো সে আমার জন্য কারও সাথে বন্ধুত্ব এবং আমারই জন্য কারও সাথে শত্রুতা করেছিল কি না।”

শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, (ফুতুহাত– ১৮১ বাব): “পীরের সাথে আদব রক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তা'লার সাথে আদব রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যদি তাঁর এমন কোন ‘মাস্তানী’ অবস্থা দেখ যার জন্য তিনি শরীয়তের সীমারেখার পূর্ণ খেয়াল রাখতে পারছেন না, তবে তাঁকে আল্লাহ্তা'লার সাথে তাঁর হালতের উপর ছেড়ে দাও। তুমি কিন্তু তাঁর হালতের (অথবা

হালতজনিত ক্রিয়ার) অনুসরণ করো না। কারণ, হালতের দরুণ তাঁর আকলের মধ্যে ত্রুটি এসেছে। (তোমার কষ্টিপাথর এই যে) তুমি এমন কোন ব্যক্তির অনুসরণ করো না, যে শরীয়তের সীমারেখা হতে দূরে পড়ে গেছে, যদিও সে আল্লাহ্‌র তরফ হতে সংবাদাদি দিক না কেন। (পীরের কোন কাজ শরীয়তের খেলাফ হলে তা যে মুরীদের জন্য অনুসরণীয় নয়, সে সম্বন্ধে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি।)

কোন মানুষ ত্বরিকতের পথে আদৌ উন্নতি লাভ করতে পারেনা, যে পর্যন্ত না সে পীর অবলম্বন করে, পীরের প্রতি করণীয় পূর্ণভাবে আদায় করে এবং পীরের খেদমত করে। পীর অবলম্বন ব্যতীত যে ব্যক্তি ত্বরিকতের দাবী করে, তার পীর হচ্ছে ইবলিস। পীর অবলম্বন ব্যতীত যদি কারও কাছ হতে কোন কারামতও প্রকাশ পায়, তবে বুঝতে হবে যে তা কারামত নয়, তা 'এসতেদরাজ'। যে দজ্জাল শেষ জমানায় প্রকাশিত হবে, তার নিকট হতেও এরূপ বহু 'এসতেদরাজ' প্রকাশিত হবে।

আবুল কাসেম জোনায়েদ বোগাদাদী (র.) বলেছেন, "পীর অবলম্বন ব্যতীত যে এই পথ চলে, সে নিজে গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ্ করে। যে মুরীদ পীরের আদব রক্ষা না করে, তাকে আল্লাহ্‌তা'লা ঈমানের নূর হতে বঞ্চিত করেন।"

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, "যে নিজের পীরকে 'কামিল' বলে আকিদা (বিশ্বাস) না রাখে, সে পীর দ্বারা আদৌ উপকৃত হবে না।"

আবু আলী দাক্কাক (র.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পীর ধরার পর পীরের কথার প্রতিবাদ করে, তার বায়েত ভেঙ্গে যায়। নুতন করে বায়েত করা তার জন্য ওয়াজিব।" বুজর্গগণ বলেছেন, "যদি কেউ পীরের কথার প্রতিবাদ করে অথবা তাঁকে হীন মনে করে, তবে তার কোন তাওবা নেই। কারণ, অন্তরে প্রতিবাদ রেখে বাইরে তাওবা করার কোন সার্থকতা নেই।"

শায়খ আবু জাফর খুলদী (র.) বলেছেন, "যে মুরীদ পীরের আদব রক্ষা না করে, তাকে কষ্ট দেবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা কতগুলো কুকুর নিযুক্ত করেন।" বুজুর্গগণ বলেন, "মনসুর হাল্লাজের উপর অত্যাচারের যে তুফান হয়েছিল, তা ওমর ইবনে ওসমান মক্কীর বদদোয়ার জন্য।"

আবু আলী দাক্কাক (র.) বলেছেন, "মোহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহ) বল্‌খী আহলে হাদিস মাজহাবপন্থী ছিলেন। এজন্য বলখের অধিবাসীগণ তাঁকে দেশ হতে বিতাড়িত করে। তজ্জন্য তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের হৃদয় হতে সততা বহিষ্কৃত করুন।" বলখবাসীগণের অধিকাংশই তাসাওউফপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরোক্ত বদ্‌দোয়ার পর হতে সে দেশে আর কোন খাঁটি সুফি হন নাই।"

শায়খ আহমদ আবীওয়ারদি (র.) বলেছেন, “সাবধান, এমন কোন কার্য করো না, যা দ্বারা তোমার পীর সাহেব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। এমন করলে তোমার পীর সাহেবের মৃত্যুর পর হতে তোমার উপর শাস্তি আসবেই।”

একদা আবু তোরাব নাখ্‌শারী ও শাকীক বলখী, হযরত আবু এয়াজিদ বোস্তামীর (র.) সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তখন তাঁর খাদেম দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন। তখন তাঁরা বললেন, “হে বৎস, তুমি আমাদের সাথে ভোজনে অংশগ্রহণ কর।” সে বলল, “না, আমি রোজা রেখেছি।” এতে আবু তোরাব (র.) বললেন, “তুমি আমাদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ কর। একমাস রোজা রাখার সওয়াব পাবে।” সে বলল “না”। তখন শাকীক বলখী (র.) বললেন, “তুমি আমাদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করে এক বৎসর রোজা রাখার সওয়াব পাবে।” সে বলল, “না”। তখন আবু এয়াজিদ বোস্তামী (র.) বললেন, “তাকে ছেড়ে দিন। সে আল্লাহ্‌র হেফাজত হতে দূরে পড়ে আছে।” অতঃপর অবস্থা এমনই হল যে, ঐ খাদেম কোন এক চুরির মামালায় অপরাধী সাব্যস্ত হল এবং তার হাত কাটা হল। বুজর্গগণের সাথে বেয়াদবীর কারণে এই পরিণাম হল।

শায়খুল ইসলাম শায়খ বোরহানুদ্দিন ইবনে আবি শরীফ (র.) বলেছেন, “যে মুরীদ পীরের ক্রটিকে নিজের নেক আমল অপেক্ষাও উত্তম মনে না করে, সে ঐ পীর দ্বারা উপকৃত হবে না।”

সাহাল ইবনে আবদেল্লাহ্‌ (র.) বলেন, “বসরা শহরে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অলি বলে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কিন্তু রুটি তৈরী করে বিক্রী করতেন। একদিন আমার এক মুরীদ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখল যে তিনি অগ্নিস্ফুলিংগের ভয়ে দূরে সরে বসে আছেন। মুরীদ মনে মনে ভাবল, ‘যদি তিনি বাস্তবিক অলিবান্দা হন, তবে অগ্নির এত ভয় কেন? অগ্নি তো অলিবান্দার কোন ক্ষতি করতে পারে না।” তিনি বললেন, “দেখ, বৎস, তুমি আমাকে হীন মনে করছ, অতএব আমার কথায় তোমার কোন উপকার হবে না।” এতদশ্রবণে মুরীদ আমার কাছে ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। আমি বললাম, “আল্লাহ্‌র অলি-বান্দাকে যে ব্যক্তি হীন মনে করে, সে তাঁর উপকার হতে বঞ্চিত হতে বাধ্য। অতএব তুমি গিয়ে তার তাজীম কর।” সে ঐ ভাবে তাঁর নিকট গেল এবং তাঁর কাছ হতে বিশেষ উপকার লাভ করল। অতঃপর সে তাওবা করল যে, জীবনে কোন অলি সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবে না।”

ঈমাম শারীন (র.) বলেন, “এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, যে মুরীদ তাজীমহীন অবস্থায় কোন পীরের সোহবত লাভ করে সে কখনও ঐ পীর দ্বারা উপকৃত হবে না এবং তাঁর কাছ হতে কোন ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারবে না”। তিনি এও বলেছেন,

“পীরের সোহবতে থেকেও যদি মুরীদের কাশ্‌ফ লাভ না ঘটে, তবে তজ্জন্য পীরকে দোষারোপ করা উচিত নয়। বরং নিজের দোষ মেনে নেয়া উচিত এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত।

আবু আলী দাক্কাক (র.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি পীর-মুর্শিদ অবলম্বন করে, ইবাদত করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের নফসানী খাহেশাতেরই ইবাদত করে থাকে।” এজন্য সমস্ত সুফিয়ায়-ই কিরামের সম্মিলিত অভিমত এই যে, ‘যে ব্যক্তি তার পীর সাহেবের হাতে তার ছোট-বড়, প্রকাশিত ও গোপনীয় যাবতীয় গোনাহ্‌ হতে তাওবা না করে এবং মানুষের যাবতীয় দাবী-দাওয়া আদায় না করে, তার পক্ষে ত্বরিকতে এসে কোন লাভ হবে না।”

আবুল কাশেম কোশায়রী (র.) বলেছেন, “মুরীদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সে কখনও পীরের আদেশ লংঘন করবে না; কারণ পীরের আদেশ লংঘন করা মুরীদের জন্য বিশেষ ক্ষতিকারক। পীরের কোন কথার প্রতিবাদ না করা মুরীদের জন্য ওয়াজিব।” তিনি এও বলেছেন, “যে মুরীদের মনে হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন মর্যাদা রয়েছে অথবা কোন মুসলমানকে সে তার চেয়ে হীন মনে করে, ত্বরিকতের পথে তার কোন স্থান নেই। মুরীদের সমস্ত সাধনা আল্লাহ্‌র দরবারে দীনতা ও হীনতা লাভের জন্য, নিজের মর্যাদা অথবা অপরের উপর উচ্চতা লাভের জন্য নয়, তা দুনিয়াবী হোক বা আখিরাতের হোক।”

আরিফ শারানী (র.) বলেন, পীরের কাছে কোন বিষয় বা কোন কথা গোপন করা মুরীদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়। যে মুরীদ তা গোপন করে, সে পীরের সাথে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। এতে তার বাইত ভঙ্গ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাকে মুরীদ হিসেবে থাকতে হলে নতুন করে তার বাইত গ্রহণ করতে হবে। এখানে সমস্ত বিষয়ের অর্থ, ত্বরিকতের আমল সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়।”

সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন এক বাক্যে বলেছেন যে, যদি কোন মুরীদ পীরের সাথে কোন প্রকার নাফরমানী করে অথবা কারও কোন ক্ষতি করে, তবে তৎক্ষণাৎ তা পীরের কাছে স্বীকার করা উচিত এবং সেজন্য পীর যে শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তা অম্লান বদনে গ্রহণ করা উচিত। এ সমস্ত অবস্থায় পীরগণ শাস্তিস্বরূপ মুরীদকে কষ্টদায়ক সুদীর্ঘ সফর করতে আদেশ করেন অথবা দীর্ঘসময় পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার আদেশ করেন অথবা অন্য কোন কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে আদেশ করেন। বুজুর্গানে দ্বীন এও এক বাক্যে বলেছেন যে, মুরীদকে শোধরানোর জন্য মুরীদের কোন অপরাধকে শাস্তি ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া কোন পীরের পক্ষে আদৌ উচিত নয়। কারণ, তাদ্দারা তাঁর

শাসনকার্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তাঁরা একবাক্যে এও বলেছেন যে, যে পর্যন্ত মুরীদ দুনিয়ার যাবতীয় সম্বন্ধ ত্যাগ না করে, সে পর্যন্ত কোন খাস জিকিরের তলকীন দেয়া কোন পীরের পক্ষে আদৌ উচিত নয়।

পীরের সাথে এমন কোন ব্যবহার করা উচিত নয়, যা দ্বারা তাঁর মনে আঘাত লাগতে পারে। কারণ, পীরের খুশীতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং পীরের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। পীর যেহেতু আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্-রসূলের আদেশের বাইরে কোন কাজের আদেশ করেন না, সেজন্য তাঁর নাফরমানী প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানী ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি কোন স্থানে উপযুক্ত পীর না পাওয়া যায়, তবে যে স্থানে পাওয়া যায় তথায়ই গিয়ে সে পীরের কাছ থেকে রিয়াজত-মেহনত করা উচিত যে পর্যন্ত না সিদ্ধিলাভ হয়। পীর কখনও আঘাত করলেও সবর করা উচিত, কেননা তিনি তার মঙ্গলের জন্যই তা করে থাকেন।

আবুল কাশেম কোশায়রী (র.) বলেছেন, "(পীর ব্যতীত অপর) কোন বৃদ্ধলোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেও সাক্ষাৎকারীর উচিত নিতান্ত তাজীমের সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা, পীরের কথা তো বহু উর্দ্ধে। পীরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে সবিশেষ ভক্তি ও তাজীমের সাথে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া উচিত, তাঁর কাছে নিজের জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া আদৌ উচিত নয়। পীরের কাছে বেয়াদবী করার দরুণ অনেককে নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করতে শোনা গেছে।"

মোহাম্মদ শানাবী (র.) বলেছেন, "আমার প্রতি আল্লাহ্তা'লার এক বিরাট দান এই ছিল যে, আমি যখন আমার পীরের নিকট যেতাম তখন আমার আকলের ডানা ভেঙ্গে যেত এবং আমি নিজেকে তাঁর পায়ের জুতার নীচে মনে করতাম। সে জন্য আমি যখন তাঁর কাছ হতে বিদায় নিতাম, তখন অনুভব করতাম যে আমার কালবে এক নূতন দান এসেছে।"

আরিফ শারানী (র.) বলেন, "পীরের অনুমতি ছাড়া কোন মুরীদের হজ্ব করা উচিত নয়। কারণ, কাবা গৃহের আদবের উপর কাবার খোদার আদবের প্রাধান্য। যে ব্যক্তি কাবার খোদার আদব না জানে, সে কাবা গৃহের আদব রক্ষা করবে কেমন করে? যে ব্যক্তি খোদার আদব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হয়ে হজ্ব করতে গমন করে, সে কাবা গৃহের প্রতি বেয়াদবীই করে থাকে। তার ফলে তেমন হজ্ব দ্বারা সে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। পীরের অনুমতি নেবার উদ্দেশ্য এই যে, পীর তার উপযুক্ততা বুঝে অনুমতি দেবেন। যদি তার মধ্যে আদবের অভাব লক্ষ্য করেন, তবে আরো অপেক্ষা করে আদব শিক্ষা করতে বলবেন যাতে তার উপযুক্ততা আসে। ত্বরিকতের পথে

আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি আদব প্রদর্শন সম্বন্ধে পীরগণ বিশেষ খেয়াল রাখেন। যথোপযুক্ত আদবসহ হজ্ব সমাপন করলে যে কি পরিমাণ ফয়েজ ও বরকত লাভ ঘটে, তা আদবসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। স্ত্রীলোকদের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি হজ্ব করা বিধেয় না হয়, তবে মুরীদের জন্য পীরের অনুমতি ছাড়া হজ্ব করা ততোধিক অবিধেয় হবে।" তিনি এও বলেছেন, "পীর অবলম্বন করার পর মুরীদের উচিত পীরকে কামিল মনে করা। এ বিশ্বাস করা যে, তিনি শরীয়ত ও ত্বরিকত সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানী। তবে বুজুর্গানেদ্বীন আবার একথাও বলেছেন যে, পীরকে এমন কামিল মনে করাও উচিত নয় যে, তিনি নবীগণের ন্যায় মাসুম ও বেগোনাহ্‌।"

তাই ঈমাম কোশায়রী (র.) বলেছেন, "কোন মুরীদের উচিত নয় যে পীরকে বেগোনাহ্‌ বলে বিশ্বাস করা। তার উচিত তিনি যে সমস্ত নেক কাজের আদেশ করেন, তা পালন করা; তাঁর ক্রিয়া বা হালতের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। যা সে জানে না, সে সম্বন্ধে পীরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হবার সর্বাপেক্ষা উত্তম কষ্টিপাথর এই যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ত্বরিকতের বরেণ্য ও মুহাক্কিক বুজুর্গগণ কি অভিমত পোষণ করতেন, তার অনুসন্ধান করা এবং অনুসরণ করা। তাঁদের বিপরীত কার্য করলে তার ফলাফল বড় খারাপ হয় এবং ধ্বংসের সম্ভাবনাও অত্যন্ত অধিক।"

শায়খ শারানী (র.) বলেন, "পীর যদি কোন মুরীদকে জিকিরের মজলিসে বসতে না দিয়ে ব্যক্তিগত কোন কাজে নিয়োগ করেন, তবে মুরীদের পক্ষে বিরক্তি বোধ করা আদৌ সংগত নয়। বিরক্ত হলে তার বাইত ভঙ্গ হয়ে যায়। সত্যিকার পীর যিনি, তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন, কোন কাজে মুরীদের মঙ্গল সাধিত হবে। মুরীদের হৃদয়ে রীয়া, সুমা, উজুব, অহংকার ইত্যাদির কোন সন্ধান পেলে তাকে অনেক সময় এমন কাজে নিযুক্ত করেন যা দ্বারা তার ঐ সমস্ত রূহানী ব্যাধির প্রতিকার সাধিত হবে। যখন সাইয়েদী ইব্রাহিম মাওয়াহেবী (র.) তার পীর সাইয়েদী আবুল মাওয়াহেব (র.)'র কাছে মুরীদ হন, তখন তাঁকে জিকিরের মজলিসে না বসিয়ে আস্তাবলে গাধা ও খচ্চরের সেবা করতে এবং বাড়ীর অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করেন এবং বলে দেন, "তুমি অন্যান্য মুরীদানের সাথে জিকিরে বা অন্য কোন মজলিসে বসো না।" এভাবে তাঁর বহু বৎসর কেটে গেল। অতঃপর আবুল মাওয়াহেব (র.)'র মৃত্যু সন্নিকট হলে মুরীদগণ তাঁর কাছে আরজ করলেন, "হুজুর, আপনার তিরোধানের পর কে আপনার খলীফা নিযুক্ত হবেন, তা বলে দিন।" তখন তিনি বললেন, "ইব্রাহীমকে নিয়ে আস।" তাঁরা তাকে ডেকে আনলে তিনি বললেন, "তাকে সাজ্জাদায় বসাও।" পরে তাঁকে

আদেশ করলেন, "তোমার পীর ভাইদের কাছে ত্বরিকত বয়ান কর।" তিনি এমন সুন্দরভাবে ত্বরিকত বয়ান করলেন যে, অন্যান্য সমস্ত মুরীদগণ সবিশেষ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা এতদিন জিকির-আজকার করেও যা না লাভ করেছেন, প্রমাণ হয়ে গেল যে শায়খ ইব্রাহিম আস্তাবলে গাধা ইত্যাদির সেবা করেই তাঁদের অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করেছেন। এ দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, পীর মুরীদের অবস্থা সম্বন্ধে অধিক ওয়াকিফহাল থাকেন। মুরীদকে কোন কাজে নিযুক্ত করলে তার জন্য অধিক মঙ্গলদায়ক হবে, তা তিনি সম্যক অবগত আছেন। অতএব, পীরের কোন আদেশ বা ব্যবস্থার উপর মুরীদের অসন্তুষ্ট হওয়া বা বিরক্ত হওয়া তার জন্য বিশেষ কুলক্ষণ বটে।"

সাইয়েদী আলী মুরসাফী (র.) বলেন, "বাইত গ্রহণ করার সময় আমার পীর আমার কাছ হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, আমি যেন তাঁর কোন নির্দেশের বা ইচ্ছার বৈপরীত্য না করি এবং আমার কোন বিষয়কে তাঁর নিকট লুকায়িত না রাখি। সেজন্য আমার আহার-বিহার-শয়ন এমন কি আমার স্ত্রী সংসর্গের পূর্বেও আমার কালবে বলতাম, "আমি এ কাজ করতে ইচ্ছুক।" যে মুরীদ পীরের সাথে এইরূপ সম্বন্ধ রাখে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সঠিক করতে পারবে।" তিনি এও বলেছেন, "যদি পীর দুনিয়ার কোন বস্তু মুরীদের জন্য নিষিদ্ধ করেন, তবে সেজন্য তার অসন্তুষ্ট হওয়া আদৌ উচিত নয়। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌তা'লাও যদি কোন দান হতে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাতে আদৌ অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কারণ, এটা অত্যন্ত বেয়াদবী এবং উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায়।"

আরিফ শারানী (র.) বলেন, "আল্লাহ্‌তা'লা যাদেরকে মহব্বত করতে আদেশ করেছেন, সে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কাকেও পীর অপেক্ষা অধিক মহব্বত করা আদৌ উচিত নয়। আল্লাহ্‌তা'লার মহব্বতকে অধিক কালবের মাঝখানে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে তাঁর সম্মুখে রাখ, যাঁদের সাথে তা রাখা ঈমানের অন্তর্গত। এরূপ ব্যক্তিবর্গের মহব্বত রাখলে পীরের মহব্বতের কোন ক্ষতি হয়না। অন্যথায় পীরের মহব্বতের মধ্যে শির্‌ক করা হয় এবং শির্‌ক বিশিষ্ট লোকদের জন্য ত্বরিকতের পথ অবরুদ্ধ।

সাইয়েদী আলী ইবনে ওফা (র.) বলেছেন, "আম্বিয়া, আওলিয়া ও সালিহীনদের মহব্বত রাখলে পীরের মহব্বতের কোন ক্ষতি হয়না। কারণ, তাঁদের জন্য মহব্বত রাখাও শরীয়তের অঙ্গ এবং শরীয়ত হল নূর। শরীয়তের নূর অধিক হলেও অপরের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয়ে যায়। শরীয়ত নিষিদ্ধ মহব্বত হল অন্ধকার। অন্ধকার কখনও নূরের সাথে সন্নিবিষ্ট হতে পারে না।" তিনি এও বলেছেন, "হে মুরীদবর্গ, তোমরা

পীরের মহব্বতের সাথে শির্‌ক করো না অর্থাৎ অন্য কারও মহব্বতকে তাঁর চেয়ে উচ্চতা দিও না। কারণ বুজুর্গানে দ্বীন আল্লাহ্‌তা'লার গুণরাজির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তা'লা যেমন শির্‌ক পছন্দ করেন না, তেমনি তাঁরাও তাঁদের মহব্বতের উপর অন্যের মহব্বত বরদাস্ত করেন না। অতএব, পীর দ্বারা উপকৃত হতে হলে তাঁর মহব্বতকে অন্যান্য সকলের মহব্বতের উপর উচ্চতা দেওয়া আবশ্যক।"

আরিফ শারানী (র.) বলেছেন, "পীরের সাথে জুম্মা ও জামাতের নামায পড়ার মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রতি মহব্বতের নিদর্শন। যদি মুরীদ অন্য কোন মসজিদেও নামায আদায় করে, তবু তার খেয়াল করা উচিত যেন সে পীরের সাথেই নামায পড়ছে।" কারণ, ফলাফল নির্ভর করে কালবের উপর, শরীরের উপর নয়।"

সেজন্য সাইয়েদী ইব্রাহীম দাসুকী (র.) তাঁর মুরীদকে বলতেন, "হে মুরীদ, যদি সত্যই তুমি আমার মহব্বত রাখ এবং আমার কাছে সত্যি বাইত গ্রহণ করে থাক, তবে জেনে রাখ যে, 'আমি তোমার নিকটবর্তী আছি। দূরে নয়। আমি তোমার খেয়ালের মধ্যে, আমি তোমার চোখের মধ্যে, আমি তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরঢু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। যদি প্রকৃত মহব্বত না রাখ, তবে আমি তোমা হতে বহু দূরে।" তিনি বলেন, "হে মুরীদ, তুমি যদি খালেস হও, তবে পীর ব্যতীত অন্য কারও সাথে বসো না। তিনি আঘাত করলে সবর করো। কারণ, পরীক্ষার জন্য পীরগণ এমন আঘাত দিয়ে থাকেন। যদি সবর করতে পার, তবে তোমার কালব আল্লাহ্‌তা'লার নূর এবং গুপ্তরহস্য বহন করার উপযুক্ত হবে।" তিনি বলেছেন, "মুরীদের কোন কার্যই পীরের বিনা অনুমতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, তিনি হলেন তাঁর প্রকৃত অলি (অভিভাবক)।"

সাইয়েদী আলী এবনো ওফা (র.) বলেছেন, "পীর তোমার জন্য আয়না স্বরূপ। যদি তুমি পীরকে মোনাফিক বলে দেখ, তবে জেনে রাখ যে, তুমি নিজেই মোনাফিক। আর যদি তাঁকে সত্যানুরাগী 'মোখলেস' বলে জান, তাহলে তুমি নিজেই সত্যানুরাগী 'মোখলেস'। কারণ, আয়নার মধ্যে নিজের অবয়বই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি যদি সঠিক পীর পাও, তাহলে জেনে রেখ যে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।" তিনি এও বলেছেন, "পীর তোমাকে কোন কাজের আদেশ করলে তুমি যদি না করতে পার, তাহলে জেনে রেখ যে তা তোমার কালবের কাবেলিয়াতের অভাবের দরূণই। পীর তোমাকে উন্নত করতে চান। কিন্তু তোমার কালবের গ্রহণক্ষমতা নেই।" তিনি বলেছেন, "তুমি পীরের কাছে কিছু চেয়ো না। তিনি যদি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর না দেন তবু চুপ থেকো। পীরকে বিরক্ত করা কোন খাঁটি মুরীদের কাজ নয়।" তিনি বলেছেন, "তুমি যদি তোমার পীরের মধ্যে উচ্চতা-বা-নীচতা অনুভব কর, তবে তা

তোমার কালবেরই উচ্চতা বা নীচতার পরিচায়ক। সাবধান, কোন কামিল সম্বন্ধে কোন ত্রুটির ধারণা রেখো না। একথা মনে করো না যে, 'আদম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র নাফরমানী করেছিলেন।' জেনে রেখো, তা হয়েছিল তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র অর্থাৎ তুমি গোনাহ্ করে ফেললে কিভাবে তোমার অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবা করা উচিত, তাই শিক্ষা দেবার জন্য তা হয়েছিল" (আ. কুদসীয়া ১৬৭-১৯০ পৃঃ)।

শায়খে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, যদি কোন পীর অন্য কোন পীরকে তাঁর অপেক্ষা অধিকতর কামিল দেখেন, তবে তাঁর উচিত তাঁর সমস্ত মুরীদগণসহ তাঁর নিকট বাইত হওয়া। তিনি যদি তা না করেন, তবে তাঁর দুনিয়াবী ইজ্জত ও উচ্চতালাভের আকাংখাই প্রকাশ পায় এবং এটা আল্লাহ্-প্রাপ্তির পথে এক বিরাট কণ্টকস্বরূপ" (জামেউল উসুল– ৯১ পৃঃ)।

শায়খ আহমদ কমশখানবী (র.) বলেছেন, "বুজুর্গানে দ্বীন একবাক্যে বলেছেন যে, বাতেনী রিপুসমূহ (যথা: কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, রীয়া, উজুর ইত্যাদি) হতে পবিত্র হয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, নম্রতা, হীনতা, দীনতা ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা এবং অন্যান্য ইবাদত করা কখনও কারও পক্ষে সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না কেউ এমন এক ব্যক্তির হাতে বাইত করে ত্বরিকতের পথে পরিচালিত হয় যিনি কামিল এবং বাতেনী ব্যাধিসমূহের নিরাময়ক ঔষধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সে বিষয়ে সচেতন আছেন। তাসাওউফ সম্বন্ধে সহস্র কিতাবাদি পাঠ করার পরও পীরের তরবীয়ত্ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যাধি হতে কেউ নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। পীরের তরবীয়ত্হীন কত ফকীহ আলেম যে এ সমস্ত ধ্বংসকারী ব্যাধিতে আক্রান্ত আছেন, তার ইয়ত্তা নেই। অগণনীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এটি সাব্যস্ত। সেজন্য ঈমাম শারানী (র.) তাঁর "আনওয়ারে কুদসীয়া" কিতাবে পীর অবলম্বন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভক্তি, শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব, বাতেনী রিপুসমূহ বিদূরিত করা কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ওয়াজিব। অতএব, যে প্রক্রিয়া ছাড়া এ সমস্ত 'ওয়াজিবাত' আদায় হয় না, তা অবলম্বন করাও ওয়াজিব হবেই।"

ত্বরিকতের পথ প্রকৃতভাবে তাওহীদ লাভের পথ এবং তাওহীদের সমীক্ষা ছাড়া এ সমস্ত ব্যাধি হতে পরিত্রাণ পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। বুজুর্গানে দ্বীন ত্বরিকতের পথে মুরীদগণকে এ তাওহীদবাদেরই তরবীয়ত্ দিয়ে থাকেন। পীরবিহীন আবিদগণকে দেখা গিয়েছে যে, তারা সমগ্র জীবনব্যাপী নামায, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত

ইত্যাদি করে থাকেন বটে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও রীয়া, সুমা ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধি হতে পরিত্রাণ পেতে পারেন নি” (জামেউল উসুল ১২৬ পৃঃ)।

ঈমাম শারানী (র.) বলেছেন, “শায়খ এজ্জুদ্দীন এবনো আবদেস সালাম (র.) যিনি ‘সুলতানুল উলামা’ খ্যাতিতে বিভূষিত ছিলেন, ফিকাহ্ শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভের পর বলেছেন, “ফিকাহ্ শাস্ত্র ছাড়া আল্লাহ্ প্রাপ্তির অন্য কোন পথ আছে কি?” তিনিই যখন শায়খ আবুল হাসান শাজলী (র.)’র হাতে বাইত হয়ে ত্বরিকতের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন বলেছিলেন, “সুফিয়ায়-ই কিরামের অবলম্বিত ত্বরিকত ছাড়া আল্লাহ্ প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নেই।” তাঁদের পথ যে সঠিক তার প্রমাণ এই যে, তাঁদের কাছ হতে যে সমস্ত কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ পায়, আজ পর্যন্ত একজন ফকীহ অথচ ত্বরিকতবিহীন আলেমের কাছ হতে প্রকাশিত হয়নি, তা যত বড় জ্ঞান-সমুদ্র বিশিষ্ট আলেমই তিনি হোন না কেন। ঈমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও ঐরূপ তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, “দেখ বৎস, তুমি হাদিস ইত্যাদি উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর, কিন্তু এই সুফি সম্প্রদায়ের কাছে যেও না।” আবার তিনিও যখন আবু হাজমা বাগদাদী (র.)’র সোহবতে থেকে সমস্ত বুঝতে পারলেন, তখন পুনঃ তাঁর পুত্রকে বললেন, “বৎস! সুফি সম্প্রদায়ের মহব্বত অবলম্বন কর। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, আল্লাহ্‌র ভয়ে এবং মোরাকাবায় আমাদের অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে। ঈমাম শাফী (র.) এ কারণে অধিকমাত্রায় সুফি সম্প্রদায়ের সাহচর্য অবলম্বন করতেন এবং বলতেন, “ফকীহ্ আলেমগণের উচিত এই সুফি সম্প্রদায়ের জ্ঞানে আলোকিত হওয়া।”

যদি কেউ বলেন, এ সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার করা যদি ওয়াজিব হত, তাহলে মুজতাহিদীন ঈমামগণ নিশ্চয় এর জন্য পৃথক কিতাব প্রণয়ন করে যেতেন। এর জবাবে বলা হবে যে, তাঁদের সময়ে এ সমস্ত ব্যাধির প্রকোপ ছিলনা। যদি থাকত তাহলে তাঁরা কুরআন-হাদিস হতে দলিলাদি সংগ্রহ করে এর প্রতিকারের পূর্ণ ব্যবস্থা করে যেতেন এবং রীয়া, সুমা, উজুব ইত্যাদি ব্যাধির কবল হতে মুক্ত থাকার যথাযথ ব্যবস্থা করে যেতেন, যেমন ফিক্‌হী মাসায়েলের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা ছিলেন দ্বীনের ঈমাম, দ্বীনের অনুসারী। মানুষের রীয়া, সুমা, উজুব ইত্যাদি বদ্ধমূল থাকুক, তাঁরা নিশ্চয় এটা চাইতেন না।

তাই ঈমাম আবুল কাশেম কোশায়রী (র.) বলেছেন, এই ব্যাধিসমূহের পূর্ণ বিকাশ হয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানা হতে তিন শতকের শেষাংশে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমার যুগের লোক সর্বোত্তম, তৎপর উত্তম তৎসংলগ্ন লোকগণ; অতঃপর উত্তম লোক তাঁরা যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী যুগের সাথে সংলগ্ন।”

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁদের মহৎ হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা যে কামিল হবেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ হাদিসই প্রমাণ যে, তাঁরা এ সমস্ত ব্যাধিবিমুক্ত ছিলেন।

তাঁর আবির্ভাবের তিন শতাব্দী পর যখন এ সমস্ত ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেল, সে সময় বুজুর্গানে দ্বীন এর প্রতিবিধানকল্পে বিভিন্ন ত্বরিকতের ব্যবস্থা করলেন এবং কিতাবসমূহ লিখিত হল। এ কিতাবসমূহই তাসাওউফের কিতাব বলে পরিচিত। এজন্য শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া (র.) বলেছেন, "যে ফকীহ্ আলেম কোন সুফির হাতে হাত না দিয়েছে, সে তরকারীবিহীন রুটির ন্যায়।"

সাইয়েদী আলী খাওয়াস (র.) বলেছেন, "যে ফকীহ্ আলেম কোন সুফি বুজুর্গের ফয়েজ গ্রহণ না করেছে, সে কখনও বাতেনী রোগসমূহ হতে পবিত্র হতে পারে নি" (জামেউল উসুল ১২৭ পৃঃ)।

এ সম্বন্ধে ঈমাম শারানী (র.) তাঁর "আনওয়ারে কুদসীয়া" কিতাবের ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠাতেও যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, জাহেরী ইলম দ্বারা (অর্থাৎ ফেকহী মাসায়েলের জ্ঞান দ্বারা) এ সমস্ত বাতেনী ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা করতে এ পর্যন্ত অধিকাংশ ফিক্হী আলেমগণ অকৃতকার্য হয়েছেন। এজন্য ঈমাম গাজ্জালী (র.)'র মত প্রখ্যাত আলেমকেও, যিনি 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, একজন সুফি বুজুর্গ পীর অবলম্বন করতে হয়েছিল।

ঈমাম কোশায়রী (র.) বলেছেন, "আবিদগণ দিনরাত ইবাদত করছেন ৫০০ নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে। সালিকীনদের পরিশ্রম হচ্ছে আল্লাহ্তা'লার তাওহীদের মা'রিফাত লাভের উদ্দেশ্যে। সালিকগণ ত্বরিকতের পথে প্রথম দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিশাল সৃষ্টির মালিক অন্য কেউ নাই" – অতঃপর অনুভূতি আসে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কালেমার এবং শেষে আসে "লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ্" কালেমার। এ সমস্ত অনুভূতি লাভের পর সুফি সাধকের কাছে প্রকট হয়ে উঠে যে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র কাছে ফকীর ব্যতীত কিছুই নয়।

আল্লাহ্তা'লা কুরআনে বলেছেন– "হে মানুষ, তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে ফকীর এবং আল্লাহ্তা'লাই প্রকৃত গণী (ধনী) এবং প্রশংসিত।" আল্লাহ্তা'লার এ বাণী তখন তাঁর কাছে প্রকৃত অর্থ, তথ্য ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। এজন্য প্রকৃত সুফি বাস্তবিকই প্রকৃত ফকীর। কারণ, তিনি অবলোকন করেন যে, এ আকাশ ও পৃথিবীর কোন একটি বস্তুতেও তাঁর মালিকানা স্বত্ব নেই, সবই একমাত্র আল্লাহ্তা'লার; এমন কি তাঁর নিজের দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, বাকশক্তি ইত্যাদি যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যের

একমাত্র স্বত্বাধিকারী আল্লাহ্‌তা'লা ব্যতীত আর কেউই নয়। এ জ্ঞান সবল হলে নিজেকে ফকীর ভিন্ন অন্য কিছুই সাব্যস্ত করা যায় না। এ পর্যায়ে "তাওহীদে মূলকী" তাঁর নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে।

পরবর্তী অনুভূতি "আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিশ্বে কর্মকর্তা কেউ নাই।" এর আবির্ভাবে সুফি অনুভব করেন যে, "ক্রিয়া" শব্দ দ্বারা যা কিছু বোঝা যায়– যত বৃহৎ বা যত ক্ষুদ্রই তা হোক না কেন, তার অন্তরালে রয়েছে এককভাবে আল্লাহ্‌তা'লারই ইচ্ছা, 'কাজা ও কদর।' তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হচ্ছে না, তিনিই প্রকৃত কারক– অন্তরালে থেকে ক্রিয়ার বিকাশ করছেন। এজন্য শায়খ জামী (র.) বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র কারক। তিনি ব্যতীত বাকী সমস্ত অস্ত্র স্বরূপ। অস্ত্র দ্বারা কোন তাছির হওয়া অসম্ভব। এই জ্ঞান কোন জাহেরী আবেদ ও আলেমের থাকা সম্ভব নয়।" এ অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠলে যে কোন পাপীকেও ঘৃণা করার মত সাহস আর সুফির থাকে না। আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি শরীয়তের আদেশাদি প্রচার করেন বটে, কিন্তু তাই বলে কাউকেও ঘৃণা করার বা নীচ মনে করার প্রবৃত্তি তাঁর একেবারেই লোপ পায়। কারণ, পাপী বা গুণী প্রত্যেকের ক্রিয়ার অন্তরালে আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ও ক্রিয়ার বিকাশই তিনি অবলোকন করেন। এ অনুভূতিই, "তাওহীদে আফয়ালী"। সাধনার পথে তাওহীদের এ প্রকার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই প্রকাশিত নয়।" এ কলেমার অনুভূতিই সুফিদের কাছে "আনওয়ারে সায়রে আফাকী"র ফল। তেমনিভাবে "আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই আবার অপ্রকাশিতও নয়"––এটি "আনওয়ারে সায়রে আন্‌ফুসি"র নতাজা (ফল)।

অতঃপর তাঁর কাছে আল্লাহ্‌তা'লার সমস্ত আসমা ও সিফাত প্রকাশিত হয়ে যায় এবং তিনি প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি ও অবলোকন করেন আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র 'হাজের' (উপস্থিত), তিনিই 'নাজের' (নিরীক্ষণকারী), একমাত্র 'সামী' (শ্রোতা), একমাত্র 'বাসির' (দর্শক), একমাত্র 'মায়ী' (সাথী)। তিনি জীবন-রগ অপেক্ষাও নিকটবর্তী। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর সক্রিয় সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ হতে বেঁচে থাকার ও সৎকার্য করার শক্তি কারও নেই।"

এই অনুভূতিসমূহের বিকাশ হওয়ার পর স্বভাবতঃই সুফি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যেতে থাকেন–এটিই হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছু ভুলে যাওয়ার স্তর। পরিশেষে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তুর উপলব্ধি তাঁর কাছ হতে লোপ পায়। তিনি যেদিকে তাকান না কেন, একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া অন্য কারও অস্তিত্বের উপলব্ধিই তাঁর হয় না। এ অবস্থায় কালামপাকের আয়াত "যেদিকেই মুখ

ফিরাও না কেন আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বই দেখতে পাবে।" এ আয়াতের মূল তথ্য ও তাৎপর্য তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

তখন তিনি "বলে দেন যে, আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়"–এ আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। তিনি স্পষ্টতঃই অবলোকন করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার অদ্বিতীয়তার (আহাদিয়াতের) অতল অপার সমুদ্রে সমগ্র সৃষ্টির এ অলীক ছবি ওৎপ্রোতভাবে নিমজ্জিত রয়েছে অথচ সেখানে কোন 'হুলুল' (অনুপ্রবেশ) নাই; কোন 'ইত্তেহাদ' (একীভুত হওয়া) নাই (i.e. No absorption, No unification) আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত ছবিগুলো যেমন 'হুলুল' ও 'ইত্তেহাদ' ব্যতীতই নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এ বিশ্বও তদ্রূপ আল্লাহ্‌তা'লার অকল্পনীয় অস্তিত্ব সমুদ্রে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত রয়েছে। তখন সুফির উপলব্ধি হয় যে, "একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ং অস্তিত্ববান নয়, সমস্ত কিছু তাঁর অস্তিত্বের মহাপারাবারে অস্তিত্ববান হয়ে রয়েছে।" তাই সাধক কবি গেয়েছেন, "স্বাতন্ত্র্য কেমন করে সম্ভবপর? যেহেতু তিনি ছাড়া কিছুই অস্তিত্ববান নয়। আমি যা দর্শন করি, হে খোদা, সবার অন্তরালে আপনিই একমাত্র অর্থ।" "আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রকৃত অস্তিত্ববান কিছুই নেই– এটি আমি 'একীনের' সাথে জানি। – সৃজন অভিধানে এটি আমি সুস্পষ্টভাবে পাঠ করছি।"

"আছ তুমি প্রতিক্ষণে, আছ দূরে, আছ কাছে,
যা কিছু আছে, তুমি আছ বলে আছে।"

অনুরূপ মর্মজ্ঞাপক পংক্তিসমূহ বহু বুজুর্গ হতে বহুল পরিমাণে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বের হয়ে এসেছে। সমস্ত উদ্ধৃত করতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এ আশংকায় বিরত থাকতে হল। এছাড়া নিম্নোক্ত হাদিসসমূহও এ মর্মেরই পরিপূরক ঃ "কবিগণ যে সমস্ত কথা বলেছেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হচ্ছে নবীদের। তিনি বলেছেন, "একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য সমস্তই প্রকৃত অস্তিত্বহীন। আল্লাহ্‌তা'লা সর্বদা বিদ্যমান এবং তিনি ছাড়া অন্য কিছুই নেই।"

ত্বরিকতের পথে সাধক যখন এ স্তরে উপনীত হন, তখন আল্লাহ্‌তা'লার 'তাওহীদের নূর' তাঁর কাল্‌ব আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং এ নূরের উজ্জ্বলতার প্রভাবে কালবের যাবতীয় শির্‌কের অপবিত্রতা এবং বাতেনী রিপুসমূহের অন্ধকারাদি একেবারে দূরীভুত হয়; রীয়া, সুমা ইত্যাদি চির নির্বাপিত হয় এবং সাধক আল্লাহ্‌র নূরে তন্ময় হয়ে থাকেন। তাঁর কালবে তাওহীদের যাবতীয় গুণাবলী যেমন; তসলীম, তফবীজ, শোকর, সবর, তাওয়াক্কুল, খাওফে ইলাহী ইত্যাদি আপন সুষমায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য, পীরের মাধ্যমে ছাড়া এমন লোভনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

কারণ, পীরের মুখ্য কাজই হচ্ছে কালবের মাধ্যমে তাওহীদের নূর এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করে তোলা যা দ্বারা সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা দূরীভূত হয় এবং প্রকৃত ইখলাস ও 'আখলাকে হামিদা' (fine attributes) ফুটে উঠে। এজন্য বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন, "ত্বরিকতের পথ হচ্ছে তাওহীদের পথ এবং আখলাকে হামিদার পথ।" শায়খ ঈমাম কোশায়রী (র.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পীর অবলম্বন না করে ইবাদতে নিমগ্ন হয়, সে এ সমস্ত তাওহীদ হতে বঞ্চিত। আল্লাহ্‌র কসম, সে ব্যক্তি মঙ্গল লাভকারী যে পীর অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ ব্যক্তি অমঙ্গলপূর্ণ যে পীর অবলম্বন করে নি অথবা পীর অবলম্বন করে তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করে নি (জামেউল উসুল– ১২৮ পৃঃ)।

শায়খ আহমদ কমশখানবী (র.) তাঁর পূর্বোক্ত কিতাবের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, পীরের মজলিসে মুরীদের কোন নফল নামায পড়া উচিত নয়। পীরের কোন কাজেই মনে মনে প্রতিবাদ করা উচিত নয় বরং যতদূর সম্ভব তাঁর কাজের তা'বীর করে নেয়া উচিত। যদি তাতে অক্ষম হয়, তবে মনে করা উচিত যে, তার বোধশক্তির অভাবের দরুণ সে তা বুঝতে পারছে না। কারণ, পীরের অনেক কাজ তাঁর হালত অনুযায়ী হতে থাকে, যার অনুসরণ মুরীদের জন্য বিষতুল্য হতে পারে। পীরের কার্যাদি অনুসরণ বিষয়ে কষ্টিপাথর শরীয়ত; যদি তা শরীয়তসম্মত না হয়, তবে আদৌ অনুসরণযোগ্য নয়– অবশ্য প্রতিবাদও করা উচিত নয়– পীরের হালতের প্রতি লক্ষ্য করে ছেড়ে দেয়া উচিত।

সাইয়েদী মোহাম্মদ ওফা (র.) বলেছেন, "পীর যদি মুরীদের তরফ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং যদি মুরীদ তজ্জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট না করে; তা হলে বুঝতে হবে যে, মুরীদ আল্লাহ্‌তা'লার মকরে পড়েছে" (আনওয়ারে কুদসীয়া– ১৯৬ পৃঃ)।

সাঈয়েদী আবুল আব্বাস মারাসী (র.) বলেছেন, "তোমরা এ কামনা করোনা যে, পীর যেন তোমাদের সর্বদা হৃদয়ে স্থান দেন, বরং তোমারই সর্বদা তাঁকে তোমাদের হৃদয়ে স্থান দেবে। তোমরা যে পরিমাণে স্থান দেবে, তিনিও সে পরিমাণে স্থান দিবেন। তাঁর কাজ হচ্ছে সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌তা'লার দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ থাকা, তোমাদের দিকে নয়" (ঐ-১৯৭ পৃঃ)। তিনি এও বলেছেন, "আমল অথবা হালতের দিক দিয়ে পীর কড়াকড়ি করলে যদি মুরীদ পীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে জাহেল বেয়াদব। তার বাইত তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হবে। মুরীদ সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কড়াকড়ি করাই পীরের কাজ। তিনি আরো বলেছেন, "পীরের সাথে তোমার সম্পর্ক যদি খাঁটি হয়, তবে তোমার জিকির-আজকার এবং আমল অপেক্ষা সম্পর্কই তোমাতে অধিকতর দ্রুত

তাছির আনয়ন করবে" (ঐ-১৯৮ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "মুরীদের হৃদয় পীরের কালবের ছায়ার নিচে। যে মুরীদের হৃদয় এমন নয়, সে সমস্ত মঙ্গল হতে বঞ্চিত।" তিনি বলেছেন, "হে মুরীদ, তুমি সর্বদা পীরের নির্দেশমত পরিচালিত হবে। পীরের পদাংক অনুসরণ করে তোমার এক পদ অগ্রসর হওয়া তাঁর অনুসরণ বর্জিত হাজার মাইল পরিভ্রমণ অপেক্ষাও উত্তম।" তিনি বলেছেন, "মুরীদের আদৌ উচিত নয় পীর এবং তাঁর খেদমত হতে দূরে থাকা যে পর্যন্ত না সে ত্বরিকতের পথকে প্রত্যক্ষ দর্শন না করে। ত্বরিকতের পথ সম্বন্ধে জানলাম বা শুনলাম বললেই যথেষ্ট নয়– বরং বলতে হবে যে প্রত্যক্ষ দর্শন করলাম ও নিরীক্ষণ করলাম।" তিনি বলেছেন, "যে মুরীদ পীরের খেদমতকে নিজের পিতার খেদমতের উপর প্রাধান্য দিতে না পারে, সে বেয়াদব। পীরের খেদমত পিতার খেদমতের বহু উর্দ্ধে, কারণ, পিতা তাকে মাটি ও পানির এ দেহ লাভ করতে সাহায্য করেন; কিন্তু পীর তাকে রূহানী দেহ দান করে 'আলা ইল্লিন' পর্যন্ত উন্নীত হবার জন্য সাহায্য করে থাকেন।"

তিনি বলেছেন, "তোমার পীরের কাছ হতে এক পলক তালীম গ্রহণ করা তোমার পিতার এবং তোমার ওস্তাদের ২০ বৎসরের তালীম গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, পীর দেন রূহানী তালীম এবং তাঁরা দেন নফসানী তালীম।"

ঈমাম শারানী (র.) বলেন, "যদি আল্লাহ্‌তা'লা তোমাকে ভাল পীর দান করে থাকেন, তবে তাঁর শোকর আদায় কর। কারণ এটি এক উত্তম নিয়ামত। পীরের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে থাক ও তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাক, নচেৎ তুমি গোনাহের অপবিত্রতায় বিজড়িত হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে, যদিও তোমার ইবাদত সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের সমতুল্য হোক না কেন" (আনওয়ায়ে কুদসীয়া-১৯৯ পৃঃ)।

তিনি এও বলেছেন, "তুমি কখনও এমন ইচ্ছা পোষণ করো না যে তোমার পীর তোমার তরবীয়তের জন্যে কঠিন পরিশ্রম করুন অথবা তোমার ইচ্ছামত চলুন! আফসোস্! বর্তমানে এ প্রকার মুরীদের সংখ্যা বেশী। তারা কামনা করে পীর যেন তাদের পরামর্শ মত চলেন। প্রত্যেক মুরীদ তার অপরাপর পীর ভাইদের উপর প্রাধান্য কামনা করে। পীর যদি কোন কাজে না ডাকেন অথবা তাঁর সন্তানাদির বিবাহ-শাদীতে দাওয়াত না দেন, তবে মুরীদগণ পীরের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। অনেক মুরীদ দেখা গেছে যারা পীরকে ঠকিয়ে পর্যন্ত দু'চার টাকা উপার্জন করতে সচেষ্ট থাকে। পীরের সামান্য ত্রুটিকেও বিশেষ ঘটা করে যেখানে সেখানে প্রচার করে। পীরের সাথে দেখা হলে কদমবুচি করে, আবার চক্ষুর আড়াল হলে পীরের কুৎসা গাইতে থাকে। এমনও অনেক মুরীদ আছে যারা পীরের খেদমত করা নিজেদের জন্য হীন কাজ বলে মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ শ্রেণীর লোকেরা সমাজে নিজেদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পীর অবলম্বন করে। বুজুর্গানে দ্বীনের বাণীসমূহ হতে পাঠক একথা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, এ শ্রেণীর মুরীদগণ "মুরীদুর রাহমান" নয়, এরা প্রকৃতপক্ষে "মুরীদুশ্ শয়তান।" এদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বৃথা। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের হেফাজত করুন!

শায়খ আবুল আব্বাস মারাসী (র.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পীর অবলম্বন করে অহংকৃত হয়, সে প্রকৃত মুরীদ নয়। প্রকৃত মুরীদ সে ব্যক্তি যাকে পেয়ে পীর গর্ব অনুভব করেন" (আনওয়ারে কুদসীয়া– ২০০ পৃঃ)। তিনি বলেছেন "যে মুরীদ পীর সম্বন্ধে ভাল আকিদা না রাখে, সে কখনও তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না, অপকৃত হবে অনেক বেশী।"

শায়খ আবুল হাজ্জাজ আসকারী (র.) বলেছেন, "যে মুরীদ তার রূহ্ ও ইচ্ছাকে পীরের কাছে বিসর্জন দিতে না পারে, সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না" (ঐ- ২০০ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "পীরের সাথে মুরীদ যদি পূর্ণ ইতিকাদ, মহব্বত ও ভক্তি রাখে, তবে পীর হতে অবস্থানিক দূরত্বও তার সিদ্ধিলাভে কোন বাধা হবে না; অবশ্য পীরের সাহচর্যে থাকা অধিক মঙ্গলদায়ক।" তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আদবের সাথে পীরের খেদমত করে, সে মুরীদই সুফল লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে ইজ্জত লাভ করে। যে তা না করে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।" তিনি এও বলেছেন, "পীর অবলম্বন করে তাঁর তাজীম-তকরীম না করা মুরীদের দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।" তিনি আরো বলেছেন, "হে মুরীদ, তুমি 'সাহেবে কামাল' (অর্থাৎ যিনি ত্বরিকত ও তাওহীদ ভাল বোঝেন ও ব্যবস্থা করতে পারেন) পীর অন্বেষণ কর। যাঁর হাল ও মাকাম কোনটাই নাই তাঁর সোহবত হতে দূরে থেকো।" (ঐ ২০২ পৃঃ)

সাইয়েদ মোহাম্মদ শানাবী (র.) বলেছেন, পীরকে সাহেবে হাল অথবা কাল হতে হবে। তাঁর হালের অনুগত যদি কেউ না হয় তবে কালের অনুগত হবে।" তিনি এও বলেছেন, "ইরাকবাসীদের হাল আছে, কাল নেই। শামবাসীদের কাল আছে, হাল নেই। মিশরের অধিকাংশ পীরের হালও নেই, কালও নেই; অতএব অন্বেষণের পর পীর অবলম্বন করবে।"

শায়খ আবু মোহাম্মদ কাত্তানী (র.) বলেছেন, 'কোন মুরীদের পীরের মৃত্যু হলে যদি তা অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত পীর না পাওয়া যায় যিনি ত্বরিকতের পথে তাকে অধিক আলোক দান করতে পারেন, তবে অন্য পীর গ্রহণ না করে ঐ সাবেক পীরের নির্দেশিত পথে চলতে থাকাই তার উচিত।" তিনি বলেছেন, "পীর তাসাওউফ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বাণী বলে থাকেন, মুরীদের উচিত নয় তা অন্যলোকের কাছে প্রকাশ করা;

বিশেষ করে ঐ সমস্ত মানুষের কাছে যারা ত্বরিকতের এবং তাসাওউফের কোন স্বাদ গ্রহণ করেনি। এর জন্য পীর অসন্তুষ্ট হলে মুরীদের বিশেষ অমঙ্গল হবে" (ঐ-২০২ পৃঃ)।

এজন্য বুজুর্গগণ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জালেমদেরকে অর্থাৎ অনুপযুক্ত লোককে জ্ঞান দান করে, সে জ্ঞানকে নষ্ট করে এবং সে উপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান হতে বঞ্চিত রাখে, সে তাদের উপর অত্যাচার করে থাকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অনুপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান দান করে, তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কুকুরের গলায় মণি-মানিক্য খচিত স্বর্ণহার পরিয়ে থাকে" (মেশকাত)।

শায়খ আলী মুরসাফী (র.) বলেছেন, "হে মুরীদ, পীরের কোন গুপ্ত তত্ত্ব কারও কাছে বলো না। এমন কি তোমার পীর ভাইদের কাছেও না। তোমার উপযুক্ততা দেখে তিনি হয়তো তোমাকে বলেছেন, তোমার পীর ভাইয়ের সে উপযুক্ততা নাও থাকতে পারে। অনেক সময় আবার তাদের কেউ কেউ পীরের বাইত ভঙ্গ করে তাঁর শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করে, যেজন্য তোমার পীরের উপর বিপদের তুফান বয়ে যায়।"

আরিফ শারানী (র.) বলেন, "পীরের কোন কথার উপর "কেন" শব্দ ব্যবহার করো না। সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন একবাক্যে বলেছেন যে, যে মুরীদ পীরের কথার উপর "কেন" বলে সে ত্বরিকতের পথে আদৌ কোন মঙ্গল লাভ করবে না। এটা মস্তবড় বেয়াদবী।" এ বিষয়ে বুজুর্গানে দ্বীনের বহুবিধ বাণী রয়েছে। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা হল মাত্র। তবে এ ক্ষেত্রে কলন্দর, মস্ত এবং ঐশীপ্রেমে উন্মত্ত মজ্যুবদের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের অবস্থান সবসময় পরিবেষ্টিত নিয়মনীতি এবং কারিকুলামের বাহিরে থাকে। তাঁদের বিষয়টি ব্যতিক্রম। এটি অনুকরণযোগ্য পথ নয়, তবে প্রশংসিত।

এ স্থলে চিন্তার বিষয় এই যে, মুরীদের উন্নতি লাভ করা তার নিজের উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে অথবা পীরের উপযুক্ততার উপর। এ বিষয়ে বিভিন্ন বুজুর্গের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কিন্তু সুলতানুল আরিফীন ও শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর "ফুতুহাত" কিতাবে ৩৭৯ বাবে যা বলেছেন, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈমাম শারানী (র.) তাঁর "এওয়াকিত" কিতাবের ২য় খন্ডের ৩১/৩২ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন, তা হতে জানা যায় যে, ওয়াজ-নসিহতের তা'সির নির্ভর করে ওয়াজ শ্রবণকারীর উপযুক্ততার উপর;

ওয়াজদাতার উপযুক্ততার উপর নয়। যদি কোন ব্যক্তি কারো ওয়াজ শুনে তা গ্রহণ না করে, অথবা সে ওয়াজের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তা সে ওয়াজ শ্রবণকারীর উপযুক্ততার অভাব। না হয় সে নিশ্চয়ই সে ওয়াজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতোই। যদি বলা হয় যে, ওয়াজদাতার উপযুক্ততার অভাবের জন্যই তার ওয়াজ শ্রবণকারীর দিলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি; তাহলে অনেক নবী ও রাসূল আলাইহিমুস্‌সালামার হেদায়তের বাণী প্রচার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে (নাউজুবিল্লাহি মিন্ জা'লিক)। কারণ, হযরত নূহ আলাইহিস্‌সলামের নয়শত পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী দিনরাত ওয়াজ ও আহ্বান মানুষের দিলের উপর কোন ক্রিয়া বিকাশ করতে পারে নি, যার জন্যে তিনি বলেছিলেনঃ "হে খোদা, আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডাকা সত্বেও তারা আমার ডাকে সাড়া দেয়নি, বরং তারা আমার ডাকে আরও দূরে পালিয়ে গেছে" (কুরআন, সূরা নূহ্)।

এই যে তাঁর দিনরাত ভর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান মানুষের উপর যে কোন তা'সির আনতে পারে নি, এটা তাঁর উপযুক্ততার অভাবের জন্য নয়। কারণ, তিনি ছিলেন একজন জলিলুল কদর রাসূল; বরং এটা ছিল শ্রবণকারীদের উপযুক্ততার অভাবের জন্য। এরূপে রসূল-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু জেহেলকে কতই না বুঝিয়েছেন; কিন্তু তবু সে তাঁর কথার উপর কোন কর্ণপাত করেনি। এটা কি তাঁর উপযুক্ততার অভাবের জন্য ছিল? (নাউজুবিল্লাহি মিন্ জালিক) আদৌ নয়। বরং তিনি উপযুক্ততার উচ্চতম শিখরে বিরাজমান ছিলেন। এ স্থলে প্রত্যেক ঈমানদার স্বীকার করতে বাধ্য যে, এটা শ্রবণকারীদের গাফেল অবস্থানের ফসল এই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে এও মানতে হবে যে, ফয়েজ গ্রহণের জন্য পীরের উপযুক্ততা অপেক্ষা মুরীদের উপযুক্ততাই অধিক কার্যকরী। বরং শাইখুল আকবর (র.) এও বলেছেন যে, শ্রবণকারীর যদি উপযুক্ততা থাকে, তবে সে একজন ফাসেকের নসিহতের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, মুরীদের যদি কাবিলিয়াত না থাকে, তবে পীর যতই কাবিল থাকুন না কেন, তাঁর দ্বারা সে আদৌ উপকৃত হবে না। এরূপে পীর যদি নাকাবিল থাকে এবং মুরীদ যদি উপযুক্ত কালব্ বিশিষ্ট হয়, তবে শুধু পীরের সিলসিলার ফয়েজই তার জন্য যথেষ্ট। অতএব, যারা পীরের স্কন্ধের উপরই সমস্ত দায়িত্ব ফেলে থাকেন তারা যে নিজেদের অনুপযুক্ততার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পীরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার জন্য তারা নিজেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অপরকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য সাহায্য করে। হ্যাঁ, পীর যদি শরীয়ত, ত্বরিকত ও হাকীকতের উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং কুরআন ও সুন্নাতের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি

সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এরূপ পীরের হাতে হাত দিয়েও যদি কোন মুরীদ উপকৃত না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে মুরীদ সম্পূর্ণ নাকাবিল (অনুপযুক্ত)।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়া কখনও কামিল ওলিউল্লাহ্ হতে খালি থাকেনা, বরং বিশাল কাশ্‌ফের অধিকারী, আল্লাহ্‌র সৃজনভেদী জ্ঞানের আধার শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর কিতাব "ফুতুহাতে মক্কীয়া"র ৩৪৯ বাবে বলেছেন, "আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণের মোট সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এবং তদনুসারে প্রত্যেক যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ওলিউল্লাহ্ থাকতে বাধ্য। বরং কখনও কখনও তা অপেক্ষাও কিছু বেশী থাকেন।" এমনকি তিনি তাঁর উক্ত কিতাবের ৪৬৩ বাবে বলেছেন, "আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে কাশ্‌ফের দ্বারা তাঁর সমস্ত নবী-রাসুল ও তাঁদের উম্মতদেরকে দেখিয়েছেন। উম্মতদের মধ্যে আজ পর্যন্ত যাঁরা হয়েছেন এবং যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত হবেন সকলকেই আমি দেখেছি।" এভাবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, "আমি তাঁদের সবাইকে চিনি ও জানি। সমস্ত আওলিয়া– যাঁরা হয়েছেন এবং যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত হবেন– সবাইকে আমি দেখেছি এবং জানি। আমি অধিকাংশ নবীর কাছ হতে ফয়েজ ও জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি সমস্ত ঈমানদারকে– যাঁরা হয়েছেন এবং যাঁরা হবেন– সবাইকে দেখেছি; সবাইকে চিনি ও জানি। যাঁরা বেহেশ্‌তী হবেন, তাঁদের সবাইকে আমি জানি এবং তাঁদের সংখ্যাও জানি।"

তাঁর এ সমস্ত বাণী হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অলিআল্লাহ্ থাকবেনই। প্রত্যেক অলিআল্লাহ্ একজন নবীর রঙ্গে রঞ্জিত থাকেন। তন্মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ থাকেন, তাঁকে "গাউসুল আযম" বলা হয়। তিনি সম্পূর্ণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রঙ্গে রঞ্জিত থাকেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সৃজনের সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি হন সৃজনভেদী, তাঁর নীচে থাকেন দুইজন ইমাম। তাঁদের নীচে চারজন আওতাদ এবং তাঁদের নীচে আবদাল থাকেন চল্লিশজন; তন্মধ্যে সাতজন শ্রেষ্ঠ। তাঁদের নীচে নুজাবা সত্তরজন এবং নুকাবা তিনশত। প্রত্যেক দলের শ্রেষ্ঠজনকে আবার কুতুব বলা হয়। এভাবে অলিআল্লাহ্‌দের শ্রেণীবিভাগ হয়ে তাঁদের মোট সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজারে উপনীত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ অলিআল্লাহ্‌গণকে নিয়ে "গাউসুল আযম" প্রত্যেক রাতে গারে হেরার মধ্যে এক বৈঠক করে থাকেন। ঐ সমস্ত আউলিয়াকে "আউলিয়াউদ-দিওয়ান" বলা হয়। তাঁদের উক্ত বৈঠকে বিশ্বের যে কোন স্থান হতে অলিআল্লাহ্‌গণ পলকে এসে উপস্থিত হন, পলকে ফিরে যান। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার যে কিরূপ অভ্যন্তরীন বিশ্বশাসন চলেছে তা বর্ণনা করা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, সর্বযুগে আল্লাহ্‌তা'লার কামিল বান্দারা

আছেন। কিন্তু সমাজের আবিলতার জন্য তাঁরা এখন প্রায়শঃ অপ্রকাশিত থাকেন। যেমনটা ঈমাম শারানী (র.) তার "লাতায়েফুল মানান" কিতাবের ২য় খন্ডের ৯৬ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন। কাজেই বর্তমান সমাজে বুজুর্গগণের সংজ্ঞা অনুযায়ী কামিল পাওয়া সুকঠিন।

এমতাবস্থায় বর্তমান সমাজে যাঁদেরকে শরীয়ত, ত্বরিকত ও হাকীকতের জ্ঞানে উচ্চস্থানীয় পাওয়া যায়, তাঁদের হাতেই বাইত গ্রহণ করা উচিত, যদি তাঁদের কাছে বুজুর্গগণের নিছবতের খাঁটি সনদ পাওয়া যায়। অবশ্য বাইত গ্রহণ করার পর তাঁদের সম্পূর্ণ আদব রক্ষা করা উচিত এবং তাঁদের আদেশ পালন করে চলা উচিত।

মুরীদের ক্বাবেলিয়ত (গ্রহণ ক্ষমতা) যদি সতেজ থাকে; রিয়াজত, মেহনত নিয়মানুযায়ী করতে থাকে এবং পীরের সিলসিলাও যদি সঠিক থাকে, তবে ইন্‌শা আল্লাহ্‌তায়ালা সেই সিলসিলার মধ্যে যত সমস্ত কামিল বুজুর্গগণ সন্নিবেশিত আছেন, তাঁদের সকলের ফয়েজ প্রবাহিত হয়ে এসে মুরীদকে প্রভাবিত করে তুলবে।

হযরত বড়পীর সাহেব (র.) "ফুত্‌হুল গায়েব" কিতাবের ১৭নং মকালাতে বলেছেনঃ "যে পর্যন্ত না দিল হতে জাগতিক বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি সমূহ দূরীভুত হয়, সে পর্যন্ত পীরের আর আবশ্যকতা থাকেনা।" এটা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, যে যাবৎ মানুষের মধ্যে এ সমস্ত ত্রুটি বিরাজমান, তাবৎ সে কামালিয়াতের স্তর হতে বহু দূরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে এরূপ ত্রুটিবিশিষ্ট মানুষও কামিল বলে পরিগণিত এবং তার শত শত মুরীদ বিদ্যমান।

ঈমাম শা'রানী (র.) বলেছেন, "পীরের আদেশ ছাড়া পীরের সমস্ত ক্রিয়াকে অনুসরণ করা মুরীদের আদৌ উচিত নয় (লাতায়েফুল মানান ২য় খন্ড ৯৬ পৃঃ)। শায়খ আহমদ কামশখানবী (র.) তাঁর "জামেউল উসুল" কিতাবের ১৪২ পৃষ্ঠায় এ মত প্রকাশ করেছেন। ঈমামুত্‌ ত্বরিকত আবুল কাসেম কোশায়রী (র.) এমনও বলেছেন, "পীর যেহেতু শরীয়তের জ্ঞানের সমুদ্র, অতএব মুরীদের উচিত নয় পীরের মাজহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাবকে অবলম্বন করা। বরং তাঁর মাজহাব অবলম্বন করাই মুরীদের জন্য ওয়াজিব।" ইমাম শা'রানী (র.) তাতে মন্তব্য করেছেন, "যদি কেউ এমন পীর পেয়ে থাকে যার কাছে শরীয়তের সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই (যেমন বর্তমান যুগে অধিকাংশ পীরের অবস্থা), তবে তাকে নিজের পীর ছাড়া অন্যের কাছ হতে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধা নেই" (আনওয়ারে কুদসিয়া ৬২ পৃঃ)।

প্রকৃত পীরের স্বরূপ কি, প্রকৃত পীরের আবশ্যকতা কি এবং পীরের সাথে মুরীদের সম্পর্ক কি, তা' নির্ণয় করার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধে বহু মানদণ্ড বা কষ্টিপাথরের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এ মানদণ্ড বা কষ্টিপাথরকে সামনে রেখে আমাদের উচিত নিজেদেরকে বিচার করা, নিজেদের অবস্থা নির্ণয় করা এবং তদনুযায়ী পরিচালিত হওয়া। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করুন এবং ভণ্ডামীর করালগ্রাস হতে রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমিন!!

আল্লাহ্‌র অলিগণ ইন্তিকালের পরেও সশরীরে বর্তমান এবং সমভাবে সক্রিয়

হযরত রাসূলে পাক (দ.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে মহান আল্লাহ্‌'তালা বিশ্বজগত সংরক্ষণের জন্য তাঁর বিশেষ বান্দা অলিগণের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অলিগণ রাসূলে পাক (দ.) এর খাস প্রতিনিধি বা নায়েবে রাসূল। তাঁরা রাসূলে পাক (দ.) এর রূহানী ফয়েজের ধারক ও বাহকরূপে জগতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিধান করে চলেছেন এবং বিপথগামী লোকদের হেদায়েত করে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌ এবং মানুষের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টিকারী। অলিগণকে আল্লাহ্‌র রাস্তার পথ প্রদর্শক (Guide) বলা হয়। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তাঁরা কাশ্‌ফ বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁদের দিলে 'ইলহাম' পয়দা হয়। তাঁরা ভক্তের মনের গোপন খবর রাখেন এবং লৌহ-মাহফুজের পাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম। তাঁরা তাঁদের অনুগামীগণকে খোদার পথের সন্ধান দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দেন। 'অলি' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র বন্ধু। সুতরাং, এক বন্ধু অপর বন্ধুর গোপন ঠিকানা ও হাল-হকিকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত থাকেন। পরম বন্ধুর নাগাল পেতে হলে কখন কোন্‌ মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে এবং কোথায় কোন ঘাটে অবস্থান করলে বন্ধুর ঠিকানা মিলবে, তা অপর বন্ধু অলির নখদর্পনে থাকে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আমার অলিগণ আমার জামার (আযমত ও সম্মানের জামার) নীচে লুকায়িত। আমি ব্যতীত কেউ তাদেরকে চেনেনা। তারাও আমি ব্যতিত অপর কাউকে চেনেনা" (হাদিসে কুদ্‌সী)।

নবুয়তের পরিসমাপ্তির পর দ্বীনের পূর্ণতাকে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ রাখার অপরিহার্যতায় আহলে বাইতের পবিত্র রক্তধারায় বেলায়তী যুগের সূচনা হয়। ইমাম মেহেদী (আ.) এর আগমন পর্যন্ত বেলায়তের কর্ণধার অলিগণ দুনিয়াতে দ্বীনের হেফাযত করবেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের ঈমানকে সক্রিয় ও মজবুত রাখবেন এবং তাঁরা ইসলামের সঞ্জীবনী সুধারূপে বিরজিত থাকবেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "কিন্তু তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা বাতেনী ইল্‌মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁরাই রসূলে পাক (দ.) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী।" হযরত রসূলে করিম (দ.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে হক্কানী আলেমগণ (অলিগণ) বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নবীগণের মর্যাদাপ্রাপ্ত।" পরম প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্খী বেপরোয়া সাধক অলিগণ সহস্র পর্দাকে উন্মোচিত করে তাঁর প্রেমাভিসারে ফানাফিস্‌ শায়খ, ফানাফির রাসূল, ফানাফিল্লাহ্‌র দুর্গম স্তর পেরিয়ে বাকাবিল্লাহ্‌য় এসে স্থিতি লাভ করেন। এ মোকামে পরম প্রেমাস্পদের দর্শন মিলে,

অনির্বচনীয় ভাবের স্থায়ী মিলন ঘটে। চিরকাঙ্খিত প্রশান্তির ‘জান্নাতুল কোরবত’ হাসিল হয়। অতঃপর ‘হালে মোকামে’ উপনীত হয়ে ‘আশেক-মাশুক’ প্রেমের মিলনে একাকার হয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমাষ্পদের মিলনের মাঝে আত্মহারা হয়ে নির্বাক হয়ে যান। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেন, “এবং যখন তুমি তোমার সকল ইরাদা, মোহ বা ইচ্ছা থেকে ফানা হবে, তখন আল্লাহ্‌তালা তোমাকে রহম করবেন এবং চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। যেহেতু ‘ফানার’ পরেই ‘বাকা’ হাসিল করতে হয়। তখন তুমি বাকাবিল্লাহ্‌ হয়ে যাবে, তখন তোমার আর মৃত্যু নেই। তোমাকে এরূপ নিয়ামত দান করা হবে যার ধ্বংস নেই। এ পর্যায়ে অলিগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করে আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। আল্লাহ্‌ ভিন্ন অপর কেউ তাঁদেরকে জানতে ও চিনতে পারেনা।” হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন, “আমার বান্দা যখন নফল ইবাদত করতে থাকে, তখন আমি তাকে ভালবাসি। যখন সে আমার ভালাবাসা প্রাপ্ত হয়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা’ দ্বারা সে দেখে, আমি তার ভাষা হয়ে যাই যা’ দ্বারা সে কথা বলে, তার হাত হয়ে যাই যা’ দ্বারা সে কাজ করে, আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দ্বারা সে চলাফেরা করে।”

অলিগণ মারিফাতের সাধনায় সফলকাম হয়ে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে সৃষ্টি জগতের পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁরা বিভিন্ন মোকামে ‘যহুর মিনাল্লাহ্‌’, ‘খলিফায়ে রাসূলাল্লাহ্‌’, ‘ওয়ারেসূল আম্বিয়া’ ইত্যাদি পদবী লাভ করেন। বাকাবিল্লাহ্‌ ও হালে মোকামে উপনীত অলিগণ প্রত্যেক যুগে কুতুবুল আকতাব, গাউসে জামান, মোজাদ্দেদ ও গাউসুল আযম ইত্যাদি খেতাব লাভ করে স্রষ্টার পক্ষে রসূল করিম (দ.) এর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণকর্তৃত্ব লাভ করেন। তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাত তস্‌রুপ করার ক্ষমতার অধিকারী। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “অলিগণ পার্থিব জীবন এবং আখিরাতে কোনরূপ শোকাতুর হবেনা” –(সূরা হামীম, আয়াত ৩১)।

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (ক.) বলেন, “আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্যসমূহ আমারই সাম্রাজ্য যা আমার হুকুমের নীচে অবস্থিত। আল্লাহ্‌তালার মর্জিমত আমি হুকুম জারি করি।”

বিপুল অধ্যবসায় ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য লাভকারী ব্যক্তিগণ তাঁদের আত্মার জাগতিক কামনা-বাসনা ও নাসুতি স্বত্তাকে নির্মূল করে স্রষ্টার প্রতিনিধিরূপে অলির মর্যাদা প্রাপ্ত হন। একখন্ড লৌহ বা কয়লা আগুনের মধ্যে রাখলে তা পুড়ে লাল অগ্নিময় হয়ে যায়। ঐ লৌহকে স্পর্শ করলে তখন হাত পুড়ে যায়। তদ্রূপ খোদার প্রেমানলে পোড়া সঠিক ব্যক্তি খোদার গুণে গুণান্বিত ও খোদার রঙ্গে

রঞ্জিত হয়ে নুরানী সুরতের অলিতে পরিণত হন। তখন অলির হাতে হাত দিলে বা সোহবতে এলে খোদাকে পাওয়া যায়। প্রাণের মধ্যে ইশ্‌কে ইলাহীর মামলা শুরু হয়ে যায়। একটি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন প্রখর সূর্যালোকে রাখলে তখন এর আলো ম্রিয়মান দেখায়। কিন্তু রাতের আঁধারে লণ্ঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সূর্যরূপী আল্লাহ্‌র রাজত্বে পথহারা মানব-হৃদয়ের তমসা বিদূরিত করে ঐশী আলো দানের ভাণ্ডার লণ্ঠনরূপী অলিগণের মর্যাদা ও ক্ষমতা অতুলনীয় এবং তাঁদের এ ক্ষমতা এ পার্থিব জগৎ থেকে তাঁদের শারীরিক প্রস্থানের পরেও সমানভাবে কার্যকরী। হযরত মাওলানা রূমী (র.) বলেন, "আফসোস্ হে মুসলিম ভ্রাতৃগণ! আমি আমার পরিচয় উদঘাটনে সমর্থ নই। - - - - - প্রকৃতির মাঝে কিংবা গগনেও নয় আমার বিচরণের স্থান। নাম নিশানাহীন স্থান-কালের ঊর্ধ্বে অপরূপের মাঝে যে প্রেমচেতনা মানবাত্মা, সে অদৃশ্য-লোকেই আমি গ্রহণ করেছি এক চিরস্থায়ী আসন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সাধক তাঁর দুনিয়াবী নাসুতি স্বভাব পরিত্যাগ করে অগ্নিময় লৌহের মত খোদার নুরে নুরময় হয়ে অলিতে পরিণত হয়, যেরূপ বসন্তের আগমনে গাছের পুরাতন পাতা ঝরে নতুন পাতায় গাছ পল্লবিত হয়ে উঠে। মানবাত্মার মৃত্যু নেই, কিন্তু জীবাত্মার মৃত্যু হলে মানবাত্মা দেহপিঞ্জর মুক্ত হয়। সৃষ্টির নিয়মানুসারে অলিরা ইন্তিকালের মাধ্যমে কায়া বদল করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করেন। লোকান্তরিত হওয়ার পরে অলিগণের পবিত্র আত্মা অধিকতর সক্রিয় হয়। তাঁরা ভক্ত-বৃন্দের মাঝে রূহানী ফয়েজ-নেয়াজ বিতরণ করেন। তাঁদের পবিত্র আত্মা একই সঙ্গে একাধিক স্থানে উপস্থিত হয়ে কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনের জন্য দৈহিক শক্তি নিষ্প্রয়োজন। দুনিয়াতে অবস্থানকালেও তাঁরা আত্মার শক্তিতে বা রূহানীয়তের দ্বারা কার্য পরিচালনা করতেন। সুতরাং, জীবনমৃত্যুর দ্বারা অলিগণের উদ্দিষ্ট কার্য পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনা।

"আল-আউলিয়া লা-ইয়ামুতু" অর্থাৎ অলিগণের কোন মৃত্যু নেই। হযরত রসূলে করিম (দ.) বলেন, "নবী ও অলিগণ স্বগৃহে যেমন নামায পড়েন, তেমনি লোকান্তরিত হবার পরও রওজার মধ্যে নামায পড়েন।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর পীরভাই হযরত শাহ্ সুফি আহসান উল্লাহ্ (র.) হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) এর মাজার শরীফে 'কাশ্‌ফুল কুবুর' ধ্যান করে দেখতে পান যে, হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) রমজান মাসে কুরআন তিলাওয়াতে রত আছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, "আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) হতে তাবাররুক লাভ করি। আমি প্রতিদিন তাঁর মাজার জিয়ারত করি। যখন আমি কোন বিপদগ্রস্ত হই, তখন তাঁর মাজারে গিয়ে দু'রাকাত

সালাত আদায় করে সাহায্যের জন্য কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি এবং আমি যা চাই, আল্লাহ্‌ তা দান করেন।” কবি তাই বলেন,

“হানিফার স্মরণ কর বারবার,
কেননা তিনি তুল্য মেশ্‌ক আম্বর।
তাহার প্রশংসা যারে করি আমি ভাই
মনে হয় সে সুগন্ধি চারিদিকে ছড়াই।”

আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) ছিলেন এক মহান রসূল প্রেমিক। নবী প্রেমের কারণেই তিনি একজন কালোত্তীর্ণ মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। একদা তিনি একটা না'ত লিখে রওজায়ে আক্‌দাসের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে রওজা পাকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর রচিত কবিতাটি পাঠ করা। যখন আল্লামা জামী (র.) নবী প্রেমে বিভোর হয়ে মদীনা পানে ছুটলেন, তখন মক্কায় তৎকালীন গভর্ণরকে স্বপ্নে হুজুর (দ.) এ বলে নির্দেশ দেন যে, জামী (র.) কে যেন মদীনায় যেতে দেয়া না হয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে মক্কার গভর্ণর তাঁকে পাকড়াও করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এরপর গভর্ণর আবার হুজুর (দ.) কে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে হযরত মোহাম্মদ (দ.) বললেন, “আবদুর রহমান জামী (র.) কোন অপরাধী নয়, বরং সে কিছু কবিতা রচনা করেছে। এখানে এসে সেগুলো আমার রওজার পাশে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে চায়। যদি এমন হয়, তাহলে রওজা হতে আমার হাত মাসাফাহার (Hand Shake) জন্য বের হয়ে আসবে। তা' ঠিক হবেনা, তাই তাঁকে বলো এখানে সে যেন কবিতা পাঠ না করে।” স্বপ্নের মাধ্যমে এ সুসংবাদ শুনে গভর্ণর কারাগার হতে তাঁকে মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতি বিরাট সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন (কাসিদা-ই-নু'মান, পৃঃ ৩১২-১৩)।

একদা হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) মদীনা মনোয়ারা গিয়ে হযরত রসূল করিম (দ.) এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেনঃ

“ফী হালাতীল বু'দি রূহী কুন্‌তু উরসিলুহা
তুকারবিলুল আর্‌দা আন্নী ওয়াহিয়া নায়িবাতী।
ওয়া হাযি-হি নুবাতুল আশবাহি কাদ্‌ হাদারতু
ফাম্‌দুদ ইয়মীনাকা কায় তাহ্‌যা বিহা শাফাতী।”

অর্থাৎ “হে রসূল (দ.)! দূরে অবস্থানকালে স্বীয় রূহকে রওজা আক্‌দাসে পাঠিয়ে দিতাম যেন আমার পক্ষ থেকে আপনার কদমবুচি করে আসে। এখনতো আমি সশরীরে আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং, দয়া করে আপনার হাত

মোবারক বাড়িয়ে দিন যেন আমার ওষ্ঠ তা চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে।” এ কবিতা পাঠ করা মাত্র রওজা শরীফ হতে হযরত রসূল করিম (দ.) এর হাত মোবারক বের হয়ে আসে এবং হযরত গাউসুল আযম বড়পীর (ক.) তা মুসাফাহা ও চুম্বন করলেন এবং নিজ মাথা মোবারক রাখলেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত অলি শায়খ সৈয়দ আহমদ কবির রেফাঈ (ক.) মদীনা শরীফে হযরত বড় পীর (র.) এর অনুসরণে উক্ত কবিতা পাঠ করে হযরত রসূল করিম (দ.) এর দিদার লাভের আবেদন জানালে তিনিও এ বিরল সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। [(ক) আল-বুরহানুল মুশায়্যাদ, পৃঃ-১৪-১৫; (খ) আবু-বুরহানুল মুআইয়্যাদ, পৃঃ জ; (গ) কাসিদা-ই-নুমান, পৃঃ ৩৩৩-৩৪]

হযরত রসূল করিম (দ.) এর বেসাল শরীফের সময় হযরত জিবরীল (আ.) কর্তৃক অনুমতি পাবার পর হযরত আজরাঈল (আ.) হুজুর পাক (দ.) এর পবিত্র রূহ্ মোবারক নিয়ে আলমে বরযখে গেলে আলমে বরযখ পবিত্র রূহ মোবারক ধারণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। অতঃপর হযরত আজরাঈল (আ.) রূহ্ মোবারক নিয়ে পর পর বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়েও একই জবাব পান। অনন্যোপায় হয়ে হযরত আজরাঈল (আ.) মহান আল্লাহ্তালার নিকট এ রূহ্ মোবারক নিয়ে কি করবেন জানতে চাইলে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, “মদীনা মনোয়ারায় হযরত রসূল করিম (দ.) এর হুজরা শরিফে খোদিত রওজা শরিফে রক্ষিত আমার একমাত্র হাবিবের দেহ মোবারক এ পবিত্র রূহ্ মোবারক ধারণ করতে সক্ষম। এ পবিত্র রূহ্ মোবারক তথায় রেখে আস।” নির্দ্দেশ মোতাবেক কাজ হলো। সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব কৌশল। প্রিয়তম বন্ধু হায়াতুন্নবীর পবিত্র দেহ থেকে রূহ্ মোবারক কিরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে? তাঁকে বেসালের বাহানা দিয়ে সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত আইন শরীয়তকে রক্ষা করেছেন মাত্র। ১৯২৪ সনে ইরাকের তৎকালীন বাদশাহ্ ও প্রধান মুফ্তী স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, প্রিয় নবী (দ.) এর বিখ্যাত সাহাবা হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) ও হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) এর লাশ মোবারক যেন তাইগ্রীস নদীর উপকূলে অবস্থিত সমাধি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। কারণ, তথায় লবণাক্ত পানি ঢুকছে। উল্লেখ্য যে, ১৯২৪ সন থেকে তেরশত বৎসর পূর্বে সাহাবাদ্বয়ের লাশ মোবারক তথায় দাফন করা হয়েছিল। ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুরী সাইয়্যেদ পাশাও তদ্রূপ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নাদেশক্রমে ঈদুল আজহার দশ দিন পর পাঁচলাখ লোকের উপস্থিতিতে লাশ মোবারকদ্বয় তোলা হয়েছিল। বহু রাষ্ট্র থেকে সরকারী প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, লাশ মোবারকদ্বয় তো দূরের কথা, লাশ মোবারকদ্বয়ের

কাফন পর্যন্ত অবিকৃত দেখা গেল। পরে হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর মাযারের পাশে তাঁদেরকে পুনরায় দাফন করা হয়। (সূত্রঃ সৈয়দ মুহাম্মদ সৈয়দুল হাসান শাহ্, সীরাতে ইমামুল আম্বিয়া কুরআন আওর বাইবেল কি রোশনীমে, পুনর্মুদ্রিত ঃ তরজুমান (তেরশত বছর পর দুই সাহাবীর অবিকৃত লাশ By মাওলানা মুহম্মদ বদিউল আলম রিজভী)। আরও একটি ঘটনা। হযরত আমর বিন আ'স (রা.) মিশরে সমাহিত হন। হিজরী ৪৩ সনের ১লা শাওয়াল তিনি ইন্তিকাল করেন। এক ব্যক্তি পায়ের ইশারায় এক আগন্তুককে তাঁর মাযার দেখিয়ে দিলে লোকটির চলার ক্ষমতা সাথে সাথে রহিত হয়ে যায়। হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) এর মাযার শরীফ পুনঃ সংস্কারের সময় মাযারের কিছু অংশ উন্মুক্ত হলে মাযারের অভ্যন্তরে একটি মোটা ও ধবধবে সাদা কাফন দেখতে পাওয়া যায়।

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) পার্থিব জগতে থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উরূজে রূহানীর প্রভাবে অসংখ্য অলৌকিক কেরামতাদির দ্বারা ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেন। তাঁর বেসালের পর দেখা যায়, তাঁর অবিনশ্বর মহাশক্তিশালী রূহানী শক্তির প্রভাবে ভক্ত ও বিপদগ্রস্তগণের না-হওয়ার ও না-পাওয়ার মত দুর্লভ কাম্য বস্তুকে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনামূলে সুলভে পাওয়ার ও হওয়ার রূপদানে যত্নবান আছেন।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে তাঁর ওফাতের পর চট্টগ্রাম জেলার জাঁহাপুর নিবাসী মুফ্তী বাড়ীর মৌলভী এজাহার বিল্লাহ্ সাহেবের পিতা মৌলভী অদিয়ত উল্লাহ্ সাহেবের দিবালোকে মসজিদ পুকুরের পূর্ব পাড়ে আম গাছ তলায় প্রত্যক্ষ দর্শন, তাঁর ওফাতের পর তাঁকে স্মরণ করা মাত্র মহাসাগরের গর্ভে জাহাজডুবি হতে আরোহী উদ্ধার, মৃগীরোগ থেকে আরোগ্য লাভ, উর্স শরীফের উট বুকিং এ আশ্চর্য কেরামত, স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা থেকে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান, স্বপ্নযোগে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর জুব্বা মোবারক দিয়ে ঢেকে রাখার মাধ্যমে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর কন্যা শাহ্জাদী সৈয়দা মুনিরা খাতুন ও তাঁর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর রোগ থেকে মুক্তিলাভ প্রভৃতি অসংখ্য কেরামত পরিলক্ষিত হয়েছে এবং বর্তমানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেছেন, "আমার সরকারের এ সাহায্য হাসর তক্ জারী থাকবে।" হযরত গাউসুল আযম বড় পীর (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (র.), হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.), হযরত শাহ্জালাল (র.), হযরত শাহ্ পরান (র.), হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), হযরত সৈয়দ

দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত মোহসেন আউলিয়া (র.), হযরত আমানত শাহ্ (র.), হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.), হযরত সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (র.), হযরত তৈয়ব শাহ্ (র.) সহ যুগ যুগ ধরে আগত অসংখ্য ওলী-বুজুর্গদের ওফাত প্রাপ্তির পর শত শত কেরামত ও অলৌকিক ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র অলিগণ ওফাতের পরও সশরীরে বর্তমান এবং সক্রিয়। তাঁরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও হুকুমে যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করতে পারেন এবং যে কোন ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধলই নিবাসী ফকির আহমদ চৌধুরী কর্তৃক হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) কে সামনে চারটি বাঘ ও পেছনে দু'টি বাঘ নিয়ে সাদা কাপড় পরে শেষ রাতে পুকুরের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা, ফকির আহমদ চৌধুরীকে মধ্য রাতে হারিকেন দিয়ে পথ দেখানো, মরহুম মোহাম্মদ কোরবান আলী চৌধুরীকে ১৯২২ সালে ডাকাত থেকে উদ্ধার, মাযার শরীফের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাইকেল থেকে না নামার দরুন সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.) এর অসংখ্য ওফাতোত্তর কেরামতেও 'অলিরা যে ইন্তিকালের পরেও সমভাবে সক্রিয়'-এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাত্র বছর দু'য়েক আগে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক জনাব গোলাম রসূল সাহেব এবং হামজারাগ নিবাসী জনাব মৌলানা আবদুর রহমান আল কাদেরী সাহেব শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (র.) কে কাবা শরীফে সশরীরে দেখেছেন বলে প্রকাশ্য সভায় মন্তব্য করেছেন। অলিদের কারামত সত্য।

অলি-ই কিরামের ক্ষমতা অসীম। তাঁরা আল্লাহ্র প্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। অলিগণের সাথে দুশমনি করলে আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (হাদিসে কুদসী)। ইমামে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হযরতুল আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী (মঃজিঃআ.) সাহেব আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.) কে ওফাতের পর ১৯৭২ সনে মদীনা শরীফ জিয়ারতকালে হযরত রসূলে করিম (দ.) এর পবিত্র রওজা পাকের সামনে সশরীরে জিয়ারতরত অবস্থায় দেখেছিলেন (আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (র.), পৃঃ ১৫৫)। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত 'খায়রুল হায়াত বাদাল মওত' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র.) এর বেসাল শরীফের পর তাঁর পবিত্র লাশ মোবারক জানাযা পড়ার জন্য খাটের উপর রাখা হয়। তথায় একজন ভক্ত ভক্তিমূলক গান আরম্ভ করলে জাহেরী আলেমগণ তা নাযায়েয বলে বাধা প্রদান করতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে খাটখানা দুলতে থাকে। তৎপর তাঁর (মুর্দার) দক্ষিণ হস্ত কাফনের মধ্যে উঠানামা করতে থাকে। এটা দর্শনে জাহেরী

আলেমগণ ভীত-হতচকিত হয়ে পড়েন। হক্কানী আলেমগণ মত প্রকাশ করেন যে, গান গাওয়া বন্ধ না করলে লাশ মোবারক খাট থেকে উঠে যেতে পারে। শরীয়তের চিরাচরিত কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় গান বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। হযরত আমানত শাহ্ (র.) তাঁর নিজের জানাযার নামাযে নিজে ঘোড়ায় চড়ে এসে ইমামতি করেন বলে জীবনী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। [ড. আবদুল করিম, গরীবে নওয়াজ হযরত শাহ্ আমানত খান (র.)]। হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর রক্তও বলেছিল, 'আনাল হক'। মহান আল্লাহ্ তাই বলেন, "এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমারা তা জাননা" (সূরা বাক্বারা–১৫৪)।

একশ্রেণীর জাহেরী আলেমগণ ফতোয়া দিয়ে থাকেন, আল্লাহ্‌র অলির মাযার জিয়ারত এবং মাযারের উপর সৌধ নির্মাণ করা না যায়েজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্ কুরআন পাকের সূরা 'আসহাবে কাহাফে'র মধ্যে একে অনুমোদন দান করেছেন। নিম্নে সূরা 'আসহাবে কাহাফ' এ বর্ণিত আলোচনা সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো:

"সিনাই উপত্যকার সোজা উত্তরে রকিম শহরে ঈসায়ী ধর্মের কতিপয় যুবক (পরহেজগার ব্যক্তি) সত্যকে বিশ্বাস করে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করল। তারা এক পর্বত গহ্বরে বা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের পশ্চাতে ছিল অত্যাচারের ষ্টীম রোলার এবং সম্মুখে গুহা ছিল ঘোর অন্ধকার। তবুও তারা বিন্দুমাত্র টললনা। তারা বলল, "প্রভু, তোমার ছায়াতলে আশ্রয় চাচ্ছি এবং শুধুমাত্র তোমার উপর নির্ভর করছি।" সেভাবে তারা কয়েক বৎসর ধরে সেখানে অবস্থান করল এবং তথায় তারা এরূপভাবে ছিল যে, পার্থিব কোন ঘটনা তাদের কানে পৌঁছতনা। অতঃপর আমি (আল্লাহ্) তাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দাঁড় করালাম। উদ্দেশ্য হল, তাদের এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে কোন্দল সম্পর্কে, সে যুগের কার্যধারা ও ফলাফল সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করত তা সঠিক বলে প্রমাণ করা। ---------------আসহাবে কাহাফ কিছুক্ষণ সে গুহায় লুকিয়ে রইল। অতঃপর তারা বাইরে এসে স্থির করতে পারলনা কতদিন তারা গুহার মধ্যে ছিল। তারা তখনও শহরবাসীগণকে পূর্বের ন্যায় ভয়ের চোখে দেখল। কেননা, ইত্যবসরে দেশে যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে তারা আদৌ অবহিত ছিলনা। দেশে তখন তাদের ন্যায় সত্যানুরাগী ও খোদা-পূজারীর জয় জয়কার ছিল। তারা যে ব্যক্তিকে শহরে পাঠিয়েছিল, সে পরিবর্তিত অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হয়ে গেল। যারা এক সময়ে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তারা এখন এতই ভক্ত সাজল যে, তাদের গুহাটি এখন তীর্থস্থানে পরিণত হল। এমনকি শহরের শাসকবৃন্দ তথায় একটি উপাসনালয় নির্মাণ

করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল” (আল-কুরআন)। সত্যিকার অলির মাযারে যদি সৌধ নির্মাণ করা না-যায়েজ হতো, তাহলে আমরা হযরত বড় পীর (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (র.), হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (র.), হযরত ইমাম বোখারী (র.), হযরত আলী (রা.), ইরাক, সিরিয়া, জর্দান প্রভৃতি দেশে অবস্থিত বিভিন্ন পয়গাম্বরের মাযার গাহে সৌধের অস্তিত্ব দেখতাম না। তবে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা তথাকথিত অলি, ভুয়া অলি, ভণ্ড অলির নামে কবরগাহে সৌধ নির্মাণ আদৌ কাম্য নয়। তা কেবলমাত্র সরল ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা করার জন্য এবং ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করা হয়ে থাকে। এরূপ ঘৃণ্য প্রচেষ্টা রুখে দাঁড়ানো দরকার। প্রকৃত অলির মাযারে সৌধ বা গৃহ নির্মাণ করা এজন্য দরকার যে, তাঁরা কায়া বদল করেছেন মাত্র। তাঁদের রূহানী শক্তি তাঁদের ইন্তিকালের পূর্বে যেরূপ কার্যকরী ছিল, ইন্তিকালের পরেও সেরূপ সমভাবে সক্রিয় ও কার্যকরী আছে। আমরা জাহেরী চোখে তা অনেক সময় দেখতে পাইনা বা উপলব্ধি করতে পারিনা মাত্র। যেহেতু তাঁরা ইন্তিকাল করেও অমর, তাই তাঁদের জন্য গৃহের বা আবাসের প্রয়োজন। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) বলেন, “সোজা কথা বুঝবার যোগ্যতা সকলের থাকেনা। যেমন, সকল মোরগ আনজির ফল খেতে পারে না। হে গর্দ্দভ প্রকৃতির মানুষ! তোমার মনে রাখা উচিত যেটাকে তুমি সম্মান প্রদর্শন কর সেটা ইটের নির্মিত দালান বা নকল মসজিদ। প্রকৃত মসজিদ অলিগণের কলব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের দেহ এবং কলব সবই পবিত্র” (মসনবী)।

হজ্জ্বব্রত পালন করার সময় হযরত রাসূলে করিম (দ.) এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত না করলে হজ্জ্বব্রত পালন কি পূর্ণাঙ্গ হয়? একজন হজ্জ্বব্রত পালনকারীকে অবশ্যই ‘হাজরে আসওয়াদ’ চুম্বন করতে হয়। এতে যদি পুণ্য হয়, তবে আল্লাহ্‌র অলি বা বন্ধুগণের রওজা শরীফ জিয়ারতে বা চুমো দিতে বাধা কোথায়? এ নিয়ে ফেত্‌না-ফ্যাসাদের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? অলিদের কল্‌ব মহান আল্লাহ্‌ তালার নুরে জালাল ও নুরে জামালের প্রেম-পরশে ও প্রেমানলে জ্বলে পুড়ে অমরত্ব ও চির উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং তাঁদের দেহ মোবারক পোড়ামাটির ইটের মত চিরস্থায়িত্বের যোগ্যতাপ্রাপ্ত হয়। অলিদের রওজা মোবারকে গেলে তাঁদের পবিত্র দেহের খোশবু মিলে, নুরের রোশনীতে ভক্তের হৃদয় আন্দোলিত হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “আমি যার অন্তরকে নুরের ছটা ও আমার নাম-মহিমা হতে দূরে রাখি সে মানবিক ও আত্মিক দিক দিয়ে মরে যায়। যাকে আমার নাম-মহিমার নৈকট্য দান করি, সে অমর হয়”।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র অলিগণ ইন্তিকালের পরেও সশরীরে বর্তমান এবং সমভাবে সক্রিয়। এতে কোন সন্দেহ বা দ্বিমতের অবকাশ নেই। কবির ভাষায় বলি,

"অতি আজবশান আওলিয়ার, অতি আজব শান
সারা জাহান উড়াইয়াছে, তৌহিদ নিশান।
যদি কেহ ভাগ্যের ফলে আওলিয়ার দরবারে গেলে
কেরামত দেখিতে পাইলে হই যাবি কোরবান।
চুম্বক যেমন লোহা টানে তেমনি টানে আকর্ষণে
মিশামিশি প্রাণে প্রাণে জমিন আসমান।
যে পাইয়াছে বাতেন কথা
ভুলে যায় সংসার ব্যথা
আওলিয়ার দরবারে গিয়ে, সঁপি দে তার মন-প্রাণ।
মানবের নিজের ঘরে আওলিয়াগণ দরবার করে
দেখেনা সে অন্ধ বলে, থাকে পেরেশান (অগ্নিশিখা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩)।

তথ্য নির্দেশিকা

(১) ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রা.), কাসিদা-ই-নু'মান, গাউসুল আযম ও আলা হযরত (র.) রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, মে, ২০০০ সন। (অনুবাদ ঃ নজির আহমদ চৌধুরী)।

(২) মৌলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভুঁইয়া, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (র.) এর জীবনী ও কেরামত, গাউসিয়া আহমদীয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, দ্বাদশ প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৮ইং।

(৩) শাহজাদা সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হযরত বাবা ভাণ্ডারী, গাউছিয়া রহমান মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম ১৩৯৪ বাংলা।

(৪) জামাল আহমদ শিকদার, শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (র.), গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯ ইং।

(৫) মোঃ মাহবুব উল আলম (সম্পাদিত), হযরত শাহজাহান শাহ্ (র.), ধলই শাহী দরবার, কাটিরহাট, চট্টগ্রাম, অক্টোবর, ১৯৯৯ইং।

(৬) ডাঃ সৈয়দ সফিউল আলম, হযরত আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.), আল্ হাসনাইন একাডেমী, চট্টগ্রাম, অক্টোবর, ১৯৯৬ইং।

(৭) মাওলানা মোঃ তারিকুল ইসলাম, হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), মালঞ্চ প্রকাশন, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৫ইং।

(৮) মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.), বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৫ইং।

(৯) হযরত শাহ্ সুফি মওলানা আবুল খায়ের (র.), ফানা ফিল্লাহর পথে, খায়ের মন্‌জিল দরবার শরীফ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি, ১৯৭৬ইং।

(১০) মাহাবুবুর রহমান, মানবাত্মা, প্রেম এবং আল্লাহ্, গাউসিয়া রহমান মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, Undated।

(১১) মৌলভী আবুল খায়ের (র.), অগ্নিশিখা (২য় খন্ড), খায়ের মন্‌জিল দরবার শরীফ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০ইং।

(১২) ডঃ আবদুল করিম, গরীবে নওয়াজ হযরত শাহ্ সুফি আমানত খান (র.), চট্টগ্রাম, ১৩৯২ বাংলা।

(১৩) হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (র.), বেলায়তে মোত্‌লাকা, গাউসিয়া আহমদীয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৮৩ ইং।

(১৪) আল-কুরআন্।

(১৫) আল-হাদিস।

(১৬) মাসিক তরজুমান (বিভিন্ন সংখ্যা)।

আলোকধারা বুকস্

এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন

০১) শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
- জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২)
০২) ঐশী আলোর জলসাগর- মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৮৪)
০৩) Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari
- Syed Mohd. Amirul Islam (1992)
০৪) The Divine Spark- Md. Ghulam Rasul (1994)
০৫) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী- সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৭)
০৬) কুরআন-হাদীসের আলোকে সিজদা/সেমা প্রসঙ্গ- হাফেজ আবুল কালাম (২০০০)
০৭) হযরত গাউসল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র ওফাত শতবার্ষিকী
বিশেষ প্রকশনা (মাসিক আলোকধারা)- সম্পাদক, মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৬)
০৮) তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারিয়া (২০০৮)
০৯) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
- মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)
১০) মাইজভাণ্ডার শরীফ পরিচিতি- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৪)
১১) মাইজভাণ্ডারী জীবন-বোধ ও কর্মবাদ [একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্ষেপণ]
- মোঃ মাহবুব উল আলম (২০১৫)
১২) হযরত শেখ নিজাউদ্দিন আওলিয়া (রঃ): জীবন ও কর্ম
- প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৫)
১৩) ছহীহ নূরানী অজিফা (২০১৫)
১৪) উরস-হাদিয়ার তরতীব (২০১৫)
১৫) কালাম-এ-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (২০১৫)
১৬) ২০ রাকাত তারাভীহ্ নামায - ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৬)
১৭) রমেশ শীল, মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৭)
১৮) ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)
১৯) এসো গল্প করি- মুহাম্মদ ওহিদুল আলম (২০১৭)
২০) ওয়াসীলা গ্রহণ: একটি ইসলামী বিধান- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)
২১) তায্কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া- (সংস্করণ)- (২০১৭)
২২) তাসাওউফ সংলাপ
২৩) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র জীবন ও কর্ম তাওহীদে আদ্বীয়ান
(আস্তিক্যবাদীদের সহাবস্থান)- অধ্যাপক জহুর উল আলম (২০১৮)
২৪) ইসলাম, তাসাওউফ, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও পীর-মুরিদ সম্পর্ক
-ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৮)
২৫) মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৮)
২৬) গল্পের বাতায়ন- মুহাম্মদ ওহীদুল আলম (২০১৮)

[পুস্তকের পাশে প্রথম সংস্করণের সন উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে ১নং পুস্তকের ইতোমধ্যে দ্বাদশ সংস্করণ এবং ২নং থেকে ১০নং পুস্তকগুলোর
প্রত্যেকটার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।]